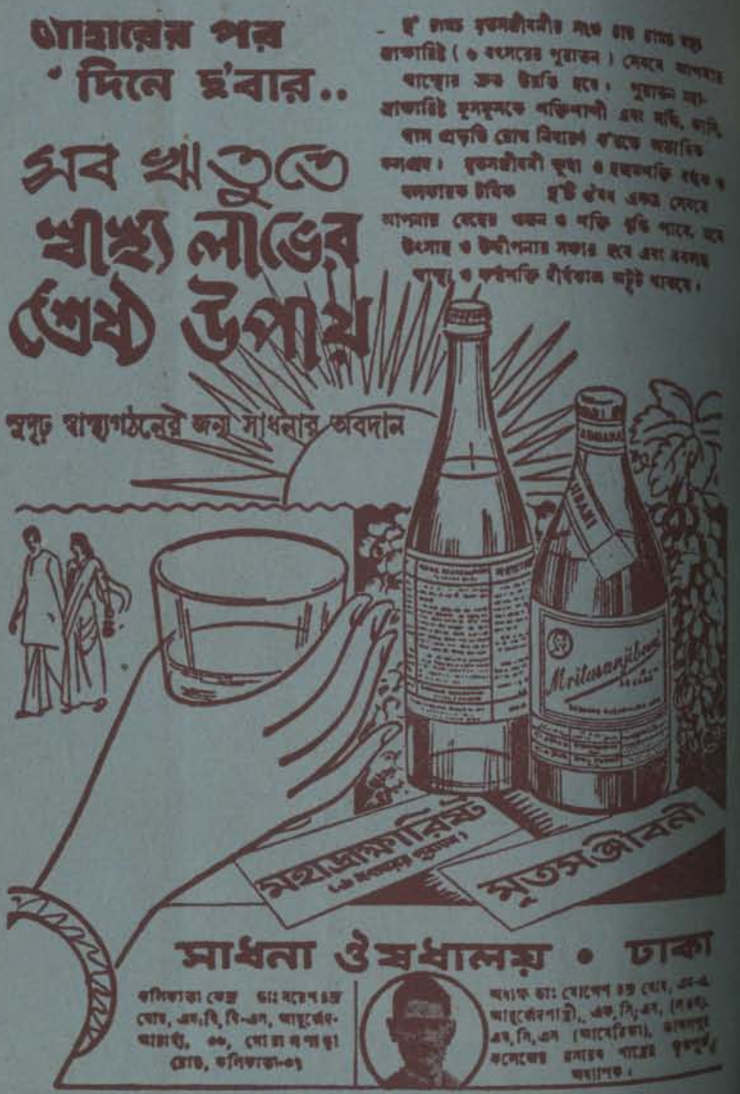


পরিচয়

অগ্রহায়ণ ১৩৬৮

সম্পাদক
গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিণ্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন ষ্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়

বর্ষ ৩১ ; সংখ্যা ৫

অগ্রহায়ণ, ১৮৮৩ ; ১৩৬৮

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

দুশান জবাভিতেল

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বড় কবি, লেখক ও নাট্যকার ছিলেন একথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সাহিত্যের কোন্ ক্ষেত্রে বাংলা তথা পৃথিবীর সাহিত্যে তাঁর দান সবচেয়ে বড় জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে অনেক মতান্তর দেখা যাবে। তাঁর ছোটগল্পের কথা উল্লেখ করবে অনেকে, বিশেষ করে বিদেশীরা।

এইরূপ জবাবের অনেক কারণ আছে। বাংলা ও সারা ভারতবর্ষের সাহিত্যের ক্রমবিকাশ দেখে বলতে হয় রবীন্দ্রনাথের আগে ভারতবর্ষে সত্যকার ছোটগল্প লেখা কারুর পক্ষে সম্ভব হয় নি। আজকে কিন্তু ছোটগল্পই হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় গর্ব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পে যে পথ দেখিয়ে দিলেন তা অনুসরণ করে বাঙালী লেখকেরা ভারতবর্ষের সীমা উত্তীর্ণ হয়ে দুনিয়ার সাহিত্যে একটা উঁচু স্থান দখল করেছেন। একটিমাত্র দুঃখের বিষয়, বিদেশে যারা বাংলা ভাষা জানে তাদের সংখ্যা খুব কম ও ইংরেজী ভাষায় বাংলা ছোটগল্পের অনুবাদ যথেষ্ট পাওয়া যায় না বলে অনেকে এই গল্পগুলির যথার্থ মূল্য বুঝতে পারে না। গেল বছরে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র-সদনে একটা তালিকা পেয়ে অবাক হয়ে দেখলাম—রবীন্দ্রনাথেরও কত গল্প এখনো ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয় নি।

আমার ছোট প্রবন্ধে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সমস্ত ছোটগল্পের বিশ্লেষণ করে একটা বিস্তৃত আলোচনা করা অসম্ভব ; তাই শুধু কয়েকটি প্রধান দিক উল্লেখ করতে পারব।

প্রত্যেক ছোটগল্পের দুটো দিক আছে—বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক। এদের
মধ্যে কোন্‌টার গুরুত্ব বেশি এ নিয়ে তর্ক করার কোনো মানে নেই।
শুধু এ-কথা বলতে হয় যে বিষয় ও রূপের ঐক্য থাকা উচিত। তাছাড়া
জীবনের বৈচিত্র্যের মতোই বিষয়বস্তুও বিচিত্র ; আর রূপ-প্রকাশের উপায়ও
একেবারে অসংখ্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে বিষয়ে ও রূপে, উভয়েই
লেখকের মতামত, চিন্তাধারা, বিচার, অনুরাগ, ঘৃণা ইত্যাদি প্রকাশ পায়।
সাহিত্য শুধু জীবনের দর্পণ নয় তো—সাহিত্য জীবনের উপর নির্ভর করে
বাস্তবতা বিচার করে ও জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করে—
চেষ্টা না করলেও প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বেশির ভাগ পল্লীসমাজের জীবন, সমস্যা, সুখ-
দুঃখ নিয়ে রচিত। তিনি যখন ১৮৯১ সালে বাংলাদেশের গ্রামে গেলেন
তখন তাঁর চারিপাশে যা দেখতে পেলেন ও গ্রাম্যসমাজের জীবনের যে
টুকরো সংগ্রহ করতে পারলেন তাই নিয়ে তাঁর ছোটগল্প লিখতে থাকলেন।
তিনি নিজে বলেছিলেন : "আমি বলব আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো
ঘটে নি, যা-কিছু লিখেছি নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।"

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্পগুলির বিষয়বস্তুকে এককথায় প্রকাশ করতে
চাইলে আমরা বলতে পারি বিষয়টা হল মানুষ—মানুষের সুখ-দুঃখ, মানুষের
বেদনা, মানুষের আনন্দ। সুখ ও আনন্দ গ্রাম্যসমাজে বেশি দেখতে পান নি
বলে তাঁর ছোটগল্পেও বেশি সুখ ও আনন্দের কথা পাওয়া যায় না।
'দেনাপাওনা', 'রামকানাইয়ের নিবুদ্ধিতা', 'ব্যবধান', 'কঙ্কাল' ইত্যাদি গল্প
পড়তে পড়তে আমরা বুঝতে পারি পল্লীসমাজের সীমাবন্ধন, প্রথার নিষ্ঠুরতা
ও অমানুষিকতা তাঁকে কী আঘাত করেছিল। 'ছেলেবেলা' ও 'জীবনস্মৃতি'তে
তিনি নিজেই বারংবার বলতেন তাঁর অল্পবয়সের জীবন কেমন সংকীর্ণ ও
বাইরের আলো-হাওয়া থেকে বঞ্চিত ছিল। এখন হঠাৎ জীবনের ঠিক
মাঝখানে এসে পড়ে তিনি বাস্তবের সমস্ত নিষ্ঠুরতা তীব্র বেদনার সঙ্গে অনুভব
করতে লাগলেন। এইভাবেই বাস্তবতা তাঁর ছোটগল্পের মধ্য দিয়েই বাংলা
ও ভারতবর্ষের সাহিত্যে প্রথমবার প্রবেশ করল। একথাও স্বীকার করতে
হয় যে তাঁর কাব্যরচনায় কিন্তু এই বাস্তবের—সামাজিক বাস্তবের—প্রবেশ
একটু দেরিতে হল। পল্লীজীবনের এই বিস্তৃত অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে আসবার

কয়েক বছর পরেই 'চিত্রা' থেকে আরম্ভ করে আমরা তাঁর কবিতায়ও সামাজিক জীবনের স্পষ্টতর প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। 'এবার ফিরাও মোরে' নামের কবিতায় তিনি যে artistic programme রেখেছিলেন তা নিজের কাব্যরচনায় যে সব সময়ে মানতে পেরেছেন তা আমি মনে করি না ; কিন্তু তাঁর ছোটগল্পে এই কর্মসূচী ঠিকই বজায় রেখেছেন। যারা বোবা, যারা অক্ষম, যারা অসহায় তারাই মূর্ত হত তাঁর ছোটগল্পে ; তারাই বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করবার পথ পেল এই ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে। তাই ড. লেস্‌নি প্রায় তিরিশ বছর আগে যথার্থই বলেছিলেন : "These stories were a revolutionary event in the world of Bengali literature ; apart from certain lyrical poems they are Tagore's finest works."

একথাও উল্লেখ না করে পারি না যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গল্পগুচ্ছ'-এ যে সমস্ত সমস্যা পাঠকদের চোখের সামনে স্থাপিত করলেন তা হল পল্লীসমাজের ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের typical problems। গ্রামের গরীব লোকের দুঃখ ও তাদের প্রতি উৎপীড়ন, পুলিশ ও জমিদারদের অত্যাচার, হিন্দুধর্মের কুসংস্কার, মেয়েদের পরাধীনতা ইত্যাদি বর্ণনা করে তিনি এ সমস্ত কুক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতেন, তাঁর প্রতিবাদ জানাতেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যে আমরা এখানে প্রথমবার তাঁর অতল মমতাবোধের স্পষ্ট প্রকাশ পাই যা হল তাঁর মানবতাবোধের ভিত্তি ; কারণ রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ কোনো abstract philosophical category নয়, কিন্তু তাঁর অন্তরের একটা অংশ যা প্রত্যেক বড় লেখক, প্রত্যেক বড় কবির অন্তরে থাকা উচিত। এই মানবতাবোধেই Romain Rolland, Maxim Gorki, Lu Hsun ইত্যাদি আধুনিক দুনিয়ার বড় লেখকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রত্যক্ষ মিল।

এদিকে 'গল্পগুচ্ছ' মানুষ রবীন্দ্রনাথকে চিনতে পারবার একটা অত্যন্ত দামী দলিল।

'গল্পগুচ্ছ'-এর নায়ক-নায়িকার একটা তালিকা তৈরি করলে আমরা দেখতে পেতাম কোন্ ধরনের লোকের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ বেশি প্রবল ছিল। অন্ধ সমাজ ও স্বার্থপর পুরুষদের অত্যাচারে উৎপীড়িত নারীদের সংখ্যা বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। 'দেনাপাওনা'-র নিরুপমা, 'কঙ্কাল' গল্পের

নায়িকা, 'ত্যাগ' গল্পের কুসুম, 'জীবিত ও মৃত' গল্পের বিধবাটি, বোবা 'সুভা', 'খাতা' গল্পের উমা, 'বিচারক' গল্পের ক্ষীরোদা, 'দিদি', 'পুত্রযজ্ঞ' গল্পের বিনোদা, 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের বিন্দু, 'হৈমন্তী' ইত্যাদি—এদের সকলের মর্মস্পর্শী কাহিনী ব্যক্তিগত আপদ-বিপদের কাহিনী নয়, সামাজিক অসমতা ও অন্যায়ের ফল বলেই রবীন্দ্রনাথ এত জোর করে বারংবার এসব বেদনাগ্রস্ত মেয়েদের কথা বলতেন।

তাঁর অনেক ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ অমানুষিক প্রথা ও কুসংস্কারগুলির পটভূমিকায় জীবিত নর-নারীর ছবি আঁকতেন, পরিবেশের সঙ্গে তাদের ব্যর্থ লড়াইয়ের কথা বলতেন ; সেই লড়াইয়ে তারা পরাজিত হয়ে মরে গেলেও moral victory অর্থাৎ নৈতিক জয় সব সময় তাদেরই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নায়ক-নায়িকা যে শুধু মরে যেতে জানে তাও নয়—পুরাতন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেও পারে। অন্তত দুটি গল্পে এরকমের বিদ্রোহের কথা পাওয়া যায়—'ত্যাগ' ও 'স্ত্রীর পত্র'। এই দুটি গল্পে রবীন্দ্রনাথ যে ধরণের দুঃসাহসী পথ দেখিয়ে দিলেন সে রকমের পথ তিনি নিজেও তাঁর নানা প্রবন্ধে কোনোদিন দেখান নি। এ বিষয়ে S. A. Dange সঠিকভাবে বলেছেন : "When Tagore wrote as a 'social reformer' or as a politician or essayist, his emotions and sentiments, his imagination and thoughts became circumscribed and inhibited. But when he wrote as a poet and a dramatist, *i. e.* when he was on the job of creation in the realm of art, he revealed himself fully and truly."

রূপের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প দেখে তার সবচেয়ে বড় [illegible] আমার মনে হয় প্রত্যেক গল্পের সমাপ্তি। দীর্ঘতায় এক একটি গল্পের মধ্যে অনেক তফাত দেখা যায় ; কিন্তু লম্বাই হোক আর ছোটই হোক, প্রত্যেক গল্প আশ্চর্যভাবে সমাপ্ত। ছোটগল্প লেখবার সময়ে সফলতার [illegible] লেখককে যে সব সময়েই শেষের point-টি মনে রাখতে হয় [illegible] রহস্যটি রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন বুঝিবা। একটার [illegible] একটা গল্প নিয়ে আমরা দেখতে পাই শেষের point-টি stress করা[illegible]

উদ্দেশ্যে সারা গল্প রচিত। তাই প্রত্যেক গল্পই আমাদের মনে এত গভীর দাগ কেটে যায়।

আর একটি কথা বলেই আমি আমার প্রবন্ধটি শেষ করব। রবীন্দ্রনাথ যে বিষয়ে গল্প লিখতেন সে বিষয়ে গল্প লেখার সবচেয়ে বড় বিপদ হল লেখকের sentimentality অর্থাৎ ভাবালুতা। অনেক আধুনিক লেখকের রচনায় একথার প্রমাণ পেতে পারি। বিপদটা রবীন্দ্রনাথ চমৎকারভাবে এড়াতে পেরেছিলেন ; তাঁর ছোটগল্পে মমতা যতই থাক sentimentality কোথাও দেখা যায় না। তা এড়াবার জন্য তিনি বরঞ্চ একটু বেশি কঠিনভাবে কথা বলেন এবং বিদ্রূপ প্রয়োগ করে তাঁর artistic লক্ষ্য সফল করেন, অনেক সময় আবার নিরপেক্ষতার ভান করে তাঁর নায়ক-নায়িকাদের কাহিনী বলেন। কিন্তু এই নিরপেক্ষতার নিচে মানুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অসীম ভালোবাসা ও সহানুভূতি পাঠক অনুভব না করে পারে না।

মানুষের প্রতি কবির সেই ভালোবাসার সবচেয়ে সুন্দর ও স্পষ্ট প্রমাণ হল তাঁর ছোটগল্প। তাই আমরা ও আমাদের সন্তান-সন্ততিরা এই গল্পগুলি বারংবার পড়ব।

প্রখ্যাত চেক্ মনস্বী ডঃ দুশান সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন। মূল বাংলায় লিখিত এই নিবন্ধটি পার্কসার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রমেলার এক আলোচনা সভায় লেখক কর্তৃক পঠিত হয়। 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য রচনাটি তিনি আমাদের দিয়েছেন—সম্পাদক।

কথা

সুনীল চট্টোপাধ্যায়

সাড়া নেই, শব্দ নেই,—ওরা ভাবল : বাঁচা গেল। কিন্তু
গোপনে অতলে তাকে নিলো এক সিন্ধু ;
কারণ, বুক ভরে সে ভারি এক বিদারণ চায়
একেবারে নিচু থেকে। ঠিক সেই বিস্ফোরণ। অতলে যা যায়।

একসময় ঠিক ফাটবে। চুপচাপ সমুদ্রের জল
দিন গোণে, কাল গোণে। একসময় জলমণ্ডল
আদিম ঝাঁপিয়ে উঠবে, মাথা ঝাঁকিয়ে। রূপ
পুরোপুরি দেখবে বলে আকাশের নীল টাল চুপ।

সামুদ্রিক প্রয়োজন। জল-ছেঁড়া উৎক্ষেপণ চাই
নিচের জলসকল বুকে তার করে আইঢাই
উপরে উলটিয়ে সব পালটে দেবে ;—ঢেউ, জলস্তর,
বিন্যাস, বাতাস, বর্ণ। বহুদূর পঁউছে দেবে স্বর।

সে-কারণে সে-ই নিলো ও-কথাটি। গভীর গোপনে
ধরে রাখবে প্রাণজোড়া, ভয়ঙ্কর ভারি শুভক্ষণে।

বাক্‌বহ্নি

অরুণাচল বসু

উচ্চারিত হতে গেলে কোন্ কণ্ঠ স্বতঃ স্ফুটমান—
আরোপিত আপ্তনতি নও তুমি, নিহিত সম্মান ;
বাচনে সূচিত, প্রীত আচরণে ললিত সুস্মিতি,
শালীন, অমিতবিত্ত, অন্তঃশীল, হে উত্তরদ্যুতি !

শতায়ু-প্রসরে এই উন্মীলিত মানচিত্রে রেখা—
তুমি কোন্ হৃদ্‌ভূমির উদ্ভাসনে রূপমগ্ন একা ?
মণ্ডিত বলয়ে স্মিত মায়াঞ্জন সন্নিহিত বুকে
অ-লক্ষ্য নিখিল-পুষ্প ফোটাবে কী বর্ণের কৌতুকে :

উত্তরিত আয়ুতীর্থে কী কল্লোল, ধৌত স্মৃতিদাহ,
উপনীত সুষমায় অভিষিক্ত ফুল্ল সে-পুণ্যাহ ;
জলে সিক্ত জলকণা, শোণিতে লোহিত শ্বেত অনু
সত্তার সুঠাম বৃক্ষ—অমল সংসক্ত বরতনু।

হে স্নাত বালার্ক, বৃত বাক্‌বহ্নি তিমির অর্গলে—
স্ফুরিত আলেখ্যে কোন্ বিমূর্ত চ্ছন্নতা যায় টলে !

সরব

মানস রায়চৌধুরী

বলতে হবে এইবেলা। তোমার মহিমা ধীরে মাঠের ওপারে অস্তগামী
"ঈশ্বর ঈশ্বর" বলে চেঁচিয়ে উঠেছি পাখি, ঘুমের ভিতরে
তারপর সেই বক্ষরেখা পীন প্রবালচুম্বিত দীপ্তি দেখে
মনে কি হয় নি তুমি স্পন্দিত যৌবন ঘিরে আরেক রকম দেবালয়
অস্থির নিঃশ্বাসে দ্রুত জেগে উঠতে হয়েছিল স্বপ্নভাঙা ভোরের বিষাদে।

ওই কান্তি, তবু উদ্ভাসিত কেন পোশাকে অনিদ্র গোলাপের
সম্মোহন এঁকে ছিলে? আলোর বাঁকানো কাঁচে শেষ বেলা যায়
আহত, জলের পাশে পড়ে আছি, অন্ধকার যেন নদীতীর—
এই বয়সের নৌকা অনীশ তরঙ্গে যাবে কোথায় ওপারে,
যদি সব ভুলে যাই, খুব তাড়াতাড়ি বলছি কার আঁচলের ক্ষমা লেগেছিল মুখে।

রোদের সকালে

পরেশ মণ্ডল

বেলাবেলি কাজ সেরে রেখো,
নাহলে অজস্র মেঘ ফোঁটাতে পা রেখে বৃষ্টি হবে
অন্ধকার ডানা ঝাড়বে। অতএব শোনো
দিনে দিনে পথ চিনে নাও।

সেদিন রাতের ঘোরে পাখিটা কেবল
কেঁদেছে বলেছে, বেশ করে
বুঝেছি আমাকে এতদিন শুধু কিনেছ বেচেছ
এবার তারার ছায়া দাও
আমি রোদ হব—গাছে গাছে রোদ হব।

এখনো সময় আছে, সবে তো বিকেল!
ছুটে যাও জল আনো, প্রদীপটা জ্বালো;
ঘুমে ঘুমে না কাটিয়ে আজকের রাত
বিরহে কাটাও;
ভোর হলে পাল তুলো, সকলের সাথে
দাঁড় ধরো রোদের সকালে।

আর্নল্‌ড্‌ ওয়েস্কারের নাটক

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগান্তকারী আদর্শ-নির্ভর আন্দোলনের ক্রমবিবর্তনে সাধারণত দু ধরনের যোগদানকারীর আধিক্য দেখা যায়। এক, শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও আস্থাশীল বিশ্বাস-প্রধান মানসিকতাসম্পন্ন ; দুই, যুক্তিপ্রসূত প্রশ্নে আত্ম-জর্জরিত বুদ্ধি-প্রধান প্রকৃতির মানুষ। আধুনিক বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনও এর ব্যতিক্রম নয়। চিন্তাটা পুরনো হলেও নতুনভাবে মনে উদিত হল আর্নল্‌ড্‌ ওয়েস্কারের তিনটি নাটক পড়ে। …"don't let me finish this life thinking I lived for nothing. We got through, didn't we ? We got scars but we got through."—বৃদ্ধা নায়িকার এই উক্তিটিতে ওয়েস্কারের 'চিকেন্ স্যুপ উইথ বার্লি'র সমাপ্তি। ওয়েস্কারের ত্রয়ীর এই প্রথম নাটকটির পরবর্তী উত্তরভাগ যথাক্রমে 'রাট্‌স্' ও 'আইম্ টকিং অ্যাবাউট্ জেরুজালেম্'। উদ্ধৃতিটিতে আদর্শানুরক্তির যে ব্যাগ্র অঙ্গীকার লক্ষ্য করি, তার সঙ্গে বুদ্ধি-উত্তেজিত সন্দেহশীলতার সংঘাত এবং অবশেষে চতুর্দিকব্যাপী নৈরাশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মানবতাবোধের উপর বিশ্বাসরক্ষার কৃচ্ছ্রসাধিত সংগ্রাম, তিনটি নাটকেরই মূল উপজীব্য। অবশ্য এ কথা সর্বদাই স্বীকার্য যে যখন অভিনয়ই নাটকের জীবনদায়ক নিঃশ্বাস, তখন মঞ্চস্বরূপেই নাটক দর্শনীয়। তার বিকল্প পঠন ; যদিও পাঠে নাটকদর্শনপ্রাপ্ত আনন্দের শতাংশও পূর্ণ হয় না। শুনেছি এ তিনটি নাটক বিলেতে প্রশংসার সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। যেহেতু তক্রপানে দুগ্ধস্বাদলিপ্সুর পরিতৃপ্তি শাস্ত্রবিধিসম্মত, তাই নাটকগুলির পঠনে দর্শনের অভিলাষ কিছু পরিমাণে সিদ্ধ হতে পারে, এই ভরসায় এ আলোচনার অবতারণা। তার পূর্বে ওয়েস্কার সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা আবশ্যক। আর্নল্‌ড্‌ ওয়েস্কার বয়সে তরুণ ; তিরিশের দ্বারপ্রান্তে সমাগত। জন্ম লণ্ডনের পূর্বাঞ্চলে। নাটক রচনায় অধুনাখ্যাত জন্ অসবোর্নের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও, তাঁকে 'অ্যাংগ্রি ইয়ং মেন্' গোষ্ঠিভুক্ত করা অন্যায় হবে। এ প্রসঙ্গে দুটি ঘটনা

গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, ওয়েস্কার শ্রমিকসন্তান ; দ্বিতীয়ত, তিনি ইহুদি বংশোদ্ভূত। স্বশ্রেণী ও স্বজাতির প্রতি গভীর অনুরাগের প্রতিফলন তাঁর নাটকের প্রতি ছত্রে পরিস্ফুট বলেই, ঘটনা দুটির উল্লেখ প্রয়োজনীয়।

'চিকেন্ স্যুপ উইথ বার্লি' ঘোরতর রাজনৈতিক নাটক। লণ্ডনের শ্রমিক-অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলের ইহুদি এলাকার একটি ছোট শ্রমজীবী পরিবার এ নাটকের প্রধান চরিত্র। বর্তমান বিলেতী শ্রমিকসাধারণের নমুনা বলে এদের বিবেচিত করা উচিত হবে না। কারণ ইহুদিজাতি সম্পর্কিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছাড়াও, রাজনৈতিকভাবেও এ পরিবারের একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা—প্রত্যেকেই কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য। সুতরাং সক্রিয় রাজনীতি এদের প্রাত্যহিক জীবনকে ব্যাপ্ত করে রয়েছে। তিরিশ থেকে শুরু করে পঞ্চাশের শেষ পর্যন্ত—এই তিন দশকের ঘটনাবহুল, আন্তর্জাতিক ইতিহাসের বিপর্যস্ত স্রোতরাশির প্রতিক্রিয়ায় পরিবারটির ক্রমপরিবর্তনই এ নাটকের উপপাদ্য বিষয়। নাটকের শুরুতে সংযোজিত নাট্যকারের স্বল্পায়ত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য : " 'চিকেন্ স্যুপ উইথ বার্লি' সোভিয়েত-বিরোধী নাটক হিসেবে কখনই লেখা হয় নি।……ইন্‌কুইজিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগের অর্থ যেমন সমগ্র খ্রীষ্টধর্মকে আক্রমণ করা নয়, ঠিক তেমনি সোভিয়েতের সাম্প্রতিক অপরাধ-স্বীকৃতির ভিত্তিতে কোনো অভিযোগ উত্থাপন করা মানেই সমাজতন্ত্র-বিরোধী আক্রমণ নয়। কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করে লাভ নেই। খুব অল্প লোকের হাতই আজ পরিষ্কার। আমরা শুধু আর একবার যেন ভেবে দেখি।" নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১৯৫৮ সালে। সুতরাং কথাগুলি অর্থব্যঞ্জক।

নাটকটির শুরু ১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বক্ষণ। আর ইংলণ্ডের ইহুদি সমাজের পক্ষে সময়টা নানা বিপজ্জনক ঘটনার সন্ধিক্ষণ। জার্মানিতে নাৎসিবাদের উত্থানের ধাক্কায় ইওরোপে ইহুদি সমাজের ভাগ্যবিপর্যয় ও খাস ইংলণ্ডে মস্‌লির নেতৃত্বে ইহুদি-বিরোধী ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাতের পটভূমিকায় প্রথম দৃশ্যের ঘটনাবলী সাজানো হয়েছে। সেরা কাহ্‌ন্, তার স্বামী হ্যারি, কন্যা এডা, পুত্র রনি ও আশেপাশের শ্রমিক বন্ধুদের ফ্যাসিস্ট-বিরোধী মিছিলে অংশ গ্রহণের উৎসাহের হাওয়ায় প্রথম দৃশ্য প্রায় উড়ে চলে। এরই ফাঁকে জানা যায় যে এডার প্রিয়তম ডেভ্‌ স্পেনের গৃহযুদ্ধে আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের সৈনিক হয়ে গণতন্ত্র

রক্ষার সংগ্রামে যোগ দিতে চলেছে। কিন্তু এই উদ্দীপনার ঢেউয়ের ভাঁজে ভাঁজে ভবিষ্যৎ সাংসারিক সঙ্কটেরও সূত্র নিহিত রয়েছে। সেরা কাহ্‌নের স্বামী হ্যারি সৎ-উদ্দেশ্যবিশিষ্ট কমিউনিস্ট, কিন্তু কর্মবিমুখ, কিছুটা ভীত ও দায়িত্বগ্রহণে অনিচ্ছুক। সেরার প্রচণ্ড জীবনীশক্তির তৎপরতার সঙ্গে তার শান্তদিনযাপনের ইচ্ছার নিত্যনৈমিত্তিক সংঘাতের দুঃসহ বর্ণনায় তাই প্রথম অঙ্ক শেষ হয়।

দ্বিতীয় অঙ্কের সময়কাল যুদ্ধের পর, ১৯৪৬ সাল। কাহ্‌ন্ পরিবার উঠে এসেছে লণ্ডনের উত্তরে হ্যাকনি অঞ্চলে—অবস্থাপন্ন ইহুদিদের বাসস্থান। আর্থিক স্বচ্ছলতাটা চোখে পড়ে। মনে রাখতে হবে যে ইতিমধ্যে লেবর দল মন্ত্রিত্ব পেয়েছে। সংসারেও কিছু পরিবর্তন হয়েছে। বড় মেয়ে এডা স্বতন্ত্র থাকে। তার স্বামী ডেভ্‌ সামরিক কর্তব্য থেকে কবে মুক্ত হয়ে ঘরে ফিরবে তার আশায় দিন গুণছে। ছোটবেলার রাজনৈতিক উৎসাহ স্তিমিত হয়ে এসেছে। পুত্র রনি সক্রিয় কমিউনিস্ট কর্মী ; মে দিবসের মিছিল-সংগঠন ও ইস্তাহার বিতরণে সর্বদাই ব্যস্ত। এ কাজে তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও উৎসাহ উদ্দীপক তার মা সেরা। অপর পক্ষে হ্যারি ক্রমশই আলস্যের চোরাবালিতে ডুবছে। একাদিক্রম জীবিকাশূন্য জীবনযাপনের মাঝে মাঝে চাকুরি জোটে ; কিন্তু কিছুকাল পরে নিজের দোষেই আবার বেকার হয়ে ঘরে ফেরে। এই নিয়ে স্ত্রী সেরার সঙ্গে দ্বন্দ্ব ক্রমেই চূড়ান্তে গিয়ে পৌছয়। একদিন কলহের কোনো এক উত্তপ্ত মুহূর্তে হ্যারি হঠাৎ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়। মনের ব্যাধি এবার শরীরকে সংক্রামিত করে। মন-মেজাজ তিক্ত হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে হ্যারির কথাগুলি তার জীবন-দর্শনের ইঙ্গিত দেয়: "What I am—I am. I will never alter···I'm an old man and if I've been the same all my life so I will always be."

তৃতীয় অঙ্কে হ্যারির পক্ষাঘাত তার সমস্ত দেহকে অক্ষম করে তোলে, বাক্‌শক্তি কেড়ে নেয়। এ পক্ষাঘাত অনেকটা প্রতীকধর্মী ; নাটকের অন্যান্য চরিত্রদের মানসিক নির্জীবতার সঙ্গে সঙ্গে হ্যারির ব্যাধিও এগিয়ে চলে। তার পুরনো বন্ধু মণ্টি পার্টি ত্যাগ করে আত্ম-প্রতিষ্ঠায় মন দিয়েছে। সেরা ও হ্যারির সবচেয়ে প্রিয় সন্তান রনি, যার উপর তাদের আশা-ভরসা ছিল প্রচুর, যে স্বপ্ন দেখত শিল্পী হবার, সেই রনি প্যারিসের কোনো হোটেলে

সামান্য পাচকের কাজ নিতে বাধ্য হয়েছে। একমাত্র সেরা, এই বার্ধক্যেও পার্টির অক্লান্ত কর্মী রয়ে গেছে। সেই অতীতের উদ্দীপনা, আদর্শবাদের উন্মাদনা এখনও সময়-অসময়ে দপ করে জ্বলে ওঠে। শেষ দৃশ্যর ঘটনার কাল ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাস। সোভিয়েতের বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেস সদ্য সমাপ্ত হয়েছে। বহুদিনের অপ্রকাশিত খবরের অপ্রত্যাশিত উদঘাটনের ধাক্কায় বিপর্যস্ত রনি ফিরে এসেছে তার একমাত্র আশ্রয়স্থল মায়ের কাছে—যে মার কাছ থেকে সমাজতন্ত্রের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল সে, যে সেরার উৎসাহ তার রাজনৈতিক জীবনের প্রাণদায়ক রক্ত-সংবহনস্বরূপ ছিল। মায়ের আদর্শবাদের কঠোর সংকল্প তার মনে আর পুরনো ভক্তি জাগায় না ; ধিক্কার দিয়ে বলে: "You're a pathological case......you're still a communist." জবাবে সেরা উত্তেজিত হয়ে জানায় কেন সে কমিউনিস্ট ; কমিউনিস্ট আদর্শবাদ রক্তের কণা হয়ে তার শরীরে বইছে। সরল ভাষায় নিজের প্রয়োজনটাকে ব্যক্ত করে: "If the electrician who comes to mend my fuse blows it instead so I should stop having electricity ? I should cut off my light ? Socialism is my light, can you understand that ? A way of life.... I've got to have light. I'm a simple person, Ronnie, and I've got to have light and love."

অবিচলিত বিশ্বাসশক্তিতে সেরা কাহ্‌ন্ হয়তো ডিকেন্‌স্‌সৃষ্ট মাদাম দেফাজ্‌ বা হেমিংওয়ের Pilar-এর সমতুল্যা হতে পারে, যদিও রক্তপিপাসু উগ্রচণ্ডা বলে তাকে কখনই ভুল হয় না। কিন্তু 'চিকেন স্যুপ উইথ বার্লি'র অভিনবত্ব সেরার চরিত্রে নয়। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ যে সকল প্রশ্ন নাট্যকার অন্যান্য চরিত্রদের মুখে দিয়েছেন, মনে হয় চিন্তাশীলতার অভিব্যক্তি তাতেই বেশি স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে। আসল কথা নাটকটিতে লেখক সমাজ-তান্ত্রিক আন্দোলন সম্পর্কে কয়েকটি সহানুভূতিসূচক দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় অঙ্কে একদা সক্রিয়া কমিউনিস্ট এডার রাজনীতিবিমুখতার কারণটা আশ্চর্য সংবেদনশীলতার সঙ্গে উদঘাটিত হচ্ছে। ছোট ভাই রনি মে-দিবসের মিছিলের প্রস্তুতি-পর্ব শেষ করে বাড়ি ফিরে এডাকে প্রশ্ন করে: আসবে তো ?

এডা : কে জানে !

রনি : কে জানে মানে? মিছিলে আর উৎসাহ পাও না?

এডা : না, পাই না।

রনি : বুঝতে পারি না। তুমি আর ডেভ্ পুরনো দিনে আগে আগে চলতে। আমি আমার সমস্ত চিন্তা তোমাদের দুজনের কাছ থেকেই পেয়েছি—অথচ এখন—”

এখন এডার দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রৌঢ়ত্ব ও শ্রান্তির ভাব এসেছে। সহরে জীবনের নিরানন্দ কায়িক শ্রমের বিরক্তি থেকে পালিয়ে গিয়ে গ্রামে বাস করার স্বপ্নে বিভোর এডা। সেরা ও হ্যারির সদাকলহপ্রিয়তার প্রতি কটাক্ষ করে এডা বলে—“In the country we shall be somewhere where the air doesn't smell of bricks and the kids can grow up without seeing grand parents who are continually shouting at each other.” তাছাড়া রাজনৈতিক কাজকর্মের বিভ্রাট থেকে চিরতরে মুক্তির সুযোগও থাকবে। রনি আশা করে ডেভ্—যে ডেভ্ স্পেনে লড়াই করেছে, সে কখনও এডার মানবসমাজ-ত্যাগের এ-প্রস্তাবে রাজি হতে পারে না। মানবসমাজের নাম শুনে এডা নাসিকাকুঞ্চিত করে। রনি অবাক হয়ে ভাবে, সমাজতন্ত্র গড়ার কাজ সবে শুরু হচ্ছে, অথচ—! এডা ঠাট্টা করে বলে—“It's always only just beginning for the Party. Every defeat is victory and every victory is the beginning.” আসলে এডার রাজনীতিবিমুখতা ও সর্বাত্মক বিদ্বেষের মূল কারণ কেবলমাত্র ব্যক্তিগত অবসাদ ও অভিজ্ঞতাই নয়। সে মনে করে সব সমস্যার মূলে রয়েছে এ যুগের শহুরে শ্রমশিল্পের অমানবিক বিস্তার। তার মা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে—“কিন্তু তাই বলে পালিয়ে যাবে? জীবন এখনও চলছে। মানুষ বিয়ে করে, তার ছেলে-মেয়ে হয়, সে হাসে, হাসবার কারণ খুঁজে পায়। মানুষ সবসময়ই হাসতে পারে। পারে না?” এডা জবাবে বলে, “এর অর্থই জীবন নয়। জঙ্গলের মধ্যেও ফুল ফোটে; তাই বলে জঙ্গলকে, তার গাছ-পালার বিশৃঙ্খলাকে, তার জন্তু-জানোয়ারের ভয়ার্ত চিৎকারকে তো আর অস্বীকার করা যায় না!” এডার পার্টির বিরুদ্ধে অভিযোগ; “তোমরা কোনোদিনও এই শ্রমশিল্প জগতের জঙ্গলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করোনি। তোমরা এ সমাজের মূল্যবোধকে ধ্বংস করতে চাওনি—নিজেরা তা শুধু অধিকার করতে চেষ্টা করেছ। যন্ত্রের মালিক না হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা

র জন্য খাটুনি—এইটেই তোমাদের কাছে সবচেয়ে বড় অন্যায় বলে গণ্য হয়ে এসেছে। যন্ত্রের মালিক হলেই যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে!” এডার এই দোষারোপের আড়ালে, খুঁজলে হয়তো কিছু সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল ঝোঁকটা উৎপাদন যন্ত্রের অধিকারের দিকেই গিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে; অথচ বর্তমান ধনতান্ত্রিক উৎপাদনশক্তি-প্রসূত শ্রমশিল্প-সমাজের মানবমন-বিধ্বংসকারী মূল্যবোধগুলির বিরুদ্ধে সচেতন আক্রমনে, আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ অনেক সময় ব্যর্থ। আধুনিক উচ্চমানের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে মেশিন-ঘনিষ্ঠ শ্রমিক যে প্রায় অটোম্যাটন বা কলের পুতুলে পরিণত হচ্ছে—এ কথা অনস্বীকার্য। শ্রমিক-আন্দোলনের পক্ষে এর চেয়ে বড় ক্ষতিকারক আর কি হতে পারে? শ্রমিকদের সংগ্রামশীলতা ও সমাজতন্ত্রের আন্দোলনকে চিরতরে পঙ্গু করে দেবার সবচেয়ে বড় উপায়, তাদের চিন্তাশক্তিকে সংজ্ঞাহীন করে দেওয়া, যন্ত্রের নিত্যনৈমিত্তিক আওতায় এনে তাদের হৃদয়কে মানবিকমূল্যশূণ্য করে তোলা; কার্ল মার্কস যার বর্ণনা করে বলেছিলেন—“...the intellectual desolation, artificially produced by converting immature human beings into mere machines for the fabrication of surplus-value, a state of mind clearly distinguishable from the natural ignorance which keeps the mind fallow without destroying its capacity for development...“(ক্যাপিটাল, ১ম পর্ব)। এ যুগের শ্রমশিল্পের ক্রমবর্ধমান যান্ত্রিকে, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এইভাবে শ্রমিকদের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার কাজে নিয়োজিত করেছে। এ সমস্যার সমাধান অবশ্যই এডা-নির্দেশিত শ্রমশিল্প-বর্জন ও গ্রাম-প্রত্যাবর্তন নয়। এ মোহের বিনাশ ঘটতে বেশি দেরি হয় না, যখন দূরের গ্রামে স্বামীর সংসার গড়তে যায় সে। এ আশাভঙ্গের কাহিনী অবশ্য ওয়েস্কারের নাটক ‘আইম্ টকিং অ্যাবাউট্ জেরুজালেম’-এ বর্ণিত হয়েছে। যাই হোক, মোটকথা, শ্রমশিল্পজগতে শ্রমিকের শ্রমপদ্ধতিকে আরও মানবোচিত করার দাবি না তুললে, শ্রমিক-আন্দোলনের সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য সাধনের হাতিয়ার—অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীই—দুর্বল হয়ে পড়বে। এ আশংকার বিস্তারিত আলোচনা ‘চিকেন স্যুপ উইথ বার্লি’তে অবশ্যই নেই; তার ইঙ্গিতটা সুস্পষ্ট। এডার শেষ কথা: “How can we

care for a world outside when the world inside is in disorder ?"

রাজনীতি থেকে পলায়নী প্রবণতাতেও মানসিক মুক্তি মেলে না। সেরা-হ্যারির পুরনো বন্ধু মন্টি সস্ত্রীক এসেছে কাহ্নদের বাড়িতে। হ্যারি পক্ষাঘাতগ্রস্ত, বাকশক্তিহীন-প্রায়। মন্টি শাক-সবজীর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা অর্জনে ব্যস্ত ; কমিউনিস্ট পার্টি ত্যাগ করেছে অনেককাল। পারস্পরিক স্মৃতি রোমন্থনের মধ্যে অতীতের রাজনৈতিক জীবনের কথা এসে পড়ে। যেহেতু সেরা আজও কমিউনিস্ট ও মন্টি পার্টিত্যাগী, ব্যাপারটা অস্বস্তিজনক হয়ে ওঠে। অন্য প্রসঙ্গে আলোচনার মোড় ফেরাবার চেষ্টা করলেও, রাজনীতি যাদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল, তাদের অতীতের স্মৃতির অর্থই কমিউনিস্ট পার্টির কথা। তাই মন্টি অবশেষে সেরাকে বোঝাতে চায় কেন সে পার্টি ছেড়েছে। সোবিয়েতের তথাকথিত ইহুদী-বিদ্বেষের কথা বলে, পার্টি কর্মীদের উগ্র স্বভাবের কথা বলে। জবাবে সেরা বলে—"And supposing it's true, Monty ? So ? What should we do ? Bring back the old days ?" মন্টি নিরুপায় হয়ে বলে—"সমস্যার কোনো সমাধান নেই।…একজন মানুষ এর বেশি কি করতে পারে ? সেরা, বিশ্বাস করো একটা বাড়ি, কয়েকটি বন্ধু আর নিজের পরিবার—এর থেকে বড় জীবনে আর কি আছে ?"

সেরা : আর যখন তোমার পরিবারের ওপর কেউ অ্যাটম ব… ফেলবে ?

মন্টি : (অনুনয়ের ভঙ্গিতে) বলো কি করতে পারি আমি ?…আমি নেহাতই সামান্য। কাকে আমি বিশ্বাস করব ? এ জগতটা বিরাট আর … উন্মাদ রাজনীতিবিদে ভর্তি ! আমি তাদের তো বিশ্বাস করতে পারি না, সেরা

মন্টির স্বচ্ছ যুক্তির আড়ালে তার নিজের অক্ষমতা ও দুর্বলতাগুলো অস্পষ্ট… ভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। অতীতকে অস্বীকার করতে গিয়েও, সে দি… গুলির উদ্দীপনা, ভ্রাতৃত্ববোধের স্মৃতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে : "A… the songs we sang together and the strikes and the rallies— Everyone in the East End was going somewhere. It w… a slum, there was misery but we were going somewh… The East End was a big mother."

এডার অবসাদজনিত রাজনীতিস্পৃহাহীনতা, মন্টির পার্টিত্যাগোত্তর অতীতমুখী আকুলতা, আমাদের দেশেও পরিচিত ঘটনা। রনি শেষ দৃশ্যে বার্থ-বিহ্বল হয়ে যখন মায়ের কাছে দাবি জানাচ্ছে : "Take me by the hand and show me who was right and who was wrong. Point them out. Do it for me. I stand here and a thousand different voices are murdering my mind."—তখন তার এই আকুতিতে আমরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেদের রাজনৈতিক দ্বিধা-সংকোচের প্রতিধ্বনি খুঁজে পাই। ঠিক এই কারণেই চরিত্রগুলি সার্থক সৃষ্টি। আসলে সমস্যাটির একদেশদর্শী সমাধান না দিয়ে, বিভিন্ন কোণ থেকে তার সামগ্রিক চেহারাটা তুলে ধরার ফলেই 'চিকেন্ স্যুপ্ উইথ্ বার্লি' একটি তাৎপর্যপূর্ণ নাটকে পরিণত হয়েছে।

ওয়েস্কারের ত্রয়ীর পরবর্তী নাটকগুলি সময়ানুক্রমিক সূচীরক্ষার প্রচলিত রীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। তাই দ্বিতীয় নাটক 'রূট্স্' যদিও এই ত্রয়ীর অন্তর্গত, সময়কালের সুনির্দিষ্ট কোনো চিহ্ন তাতে নেই। ঘটনাগুলি পূর্ববর্তী নাটকের উল্লিখিত তিনদশকের মধ্যবর্তী বলে মনে হয়। 'রূট্সের' চরিত্ররাও নূতন ও অপরিচিত। স্বচ্ছন্দে স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ নাটক বলে অভিহিত করা যায়। 'চিকেন্ স্যুপ্ উইথ্ বার্লি'র সঙ্গে এর ক্ষীণ সংযোগ রক্ষা করছে রনি, যে স্বয়ং এ নাটকে অনুপস্থিতই রয়ে যায়, কিন্তু যার অস্তিত্ব নাটকের মূল কাহিনীকে আচ্ছন্ন করে রাখে। নর্ফকের গ্রামের মেয়ে বীটি ব্রায়াণ্ট লণ্ডনে চাকরি করতে গিয়ে রনি কাহ্নের সঙ্গে প্রণয়সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। রনিকে গ্রামের বাড়িতে সপ্তাহান্ত কাটাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে, বীটি ছুটিতে বাড়ি ফেরে। রনির আগমনের অপেক্ষায় বীটির উৎসাহ এবং অবশেষে তার আসার পরিবর্তে এক হৃদয়বিদারক পত্রের প্রেরণ—যে চিঠিতে রনি জানায় যে তার পক্ষে বীটির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা নানা কারণে আর সম্ভব নয়—এই কাহিনীই 'রূট্স'-এর মূল কাঠামো। 'চিকেন্ স্যুপ উইথ বার্লি'তে যেমন শ্রমিকসম্প্রদায়ের একটা বিশেষ অংশের সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছিল, এ নাটকে আধুনিক ইংলণ্ডের গ্রামীন শ্রমজীবীর প্রতিনিধিস্বরূপ একটি পরিবারের এক মর্মান্তিক চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। বীটির গ্রাম্য মানসিকতা লণ্ডনের আবহাওয়ায় ও রনির পরিচালনায় চিন্তাশীলতার রূপ গ্রহণে প্রস্তুত হচ্ছে। স্বভাবতই তার মা-বাবা-বোনদের

আচার-ব্যবহার, রুচি, কথাবার্তা—সবকিছু সম্পর্কেই বীটির মত স্বতন্ত্র। উভয় পক্ষ থেকেই পারস্পরিক বুঝবার অক্ষমতাটা বীটি ও তার মায়ের কথোপকথনেই পরিস্ফুট। উভয়েরই সংলাপ বিরুদ্ধাভিপ্রায়প্রসূত। বীটির কথার বহুলাংশই রনি-সম্পর্কিত, নূতন সদ্য-আস্বাদিত সাংস্কৃতিক জগতের আলোর চমকে দীপ্ত। অপর পক্ষে তার মা, গ্রামের বাসি ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে বীটিকে ক্লান্ত করে তুলছে। শেষে মেয়ের বিরক্তির সুস্পষ্ট প্রকাশে মা বলে ওঠে : "I don't know what's gotten into you gal, no I don't." মায়ের হাল্কা সুরের আধুনিক গান শুনবার প্রবণতার বিরুদ্ধে বীটি নূতন আমদানী রুচিবোধের পরিচয় দেয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রেকর্ড বাজিয়ে। 'অ্যাব্স্ট্র্যাক্ট' চিত্র-রচনা করে ঘর সাজায়। রনির নজির উল্লেখ করে সস্তা 'কমিকের' বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। শুনে তার ভগ্নীপতি জিমি ঠাট্টা করে বলে : "What's alive about a person that reads books and looks at paintings and listens to classical music ?" এই নূতন রুচিবোধের সমর্থনে অবশ্য বীটি নিজের ভাষা খুঁজে পায় না ; রনির উক্তির শরণাপন্ন হতে হয়। অধিকাংশ সময়ই সে রনির ভাষায় কথা বলে। তার উদ্দীপনা, ছুটোছুটি ও কর্মতৎপরতায়, আমরা 'চিকেন স্যুপ উইথ বার্লি'র অল্পবয়সী রনির উদ্দামতার ছায়া খুঁজে পাই। বোঝা যায়, শুধু রনির কথাই নয়, তার চরিত্রের আকর্ষণীয় গুণগুলিও মেয়েটিতে সংক্রামিত হয়েছে। কারণ সমস্ত নাটকের অন্যান্য চরিত্রদের প্রাণহীন নিশ্চল ঔদাসীন্যের মধ্যে একমাত্র বীটিই জীবন্ত ও চারিপাশের ঘটনায় তার মন সংবেদনশীল। পরিবেশের সঙ্গে তার বিরোধটা গ্রাম-শহরের পুরাতন সংঘাতের পুনরুত্থান-বলে ব্যাখ্যা করলে ভুল হবে। আসলে সংঘর্ষটা বুদ্ধিবাদী শ্রমজীবী ও তার নির্মনন সহকর্মীদের মধ্যে—যে সংঘর্ষ ইংলণ্ডের গ্রাম ও শহর, উভয়ক্ষেত্রেই ক্রমবর্ধমান সত্য বলে পরিগণিত হচ্ছে। বীটি একজায়গায় মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগে বলছে : "You give me nothing that was worth while, nothing...... I can't even speak English proper because you never talked about anything important....It makes no difference country or town. All the town girls I ever worked with were just like me." জীর্ণ রুচিহীন অতীতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বীটি যত স্পষ্ট হতে পারে, বিকল্প নূতন রুচিবোধ ও সাংস্কৃতিক পরিচ্ছন্নতার সমর্থনে সে ততটা আত্ম-

নির্ভরশীল নয় ; রনির শরণাপন্ন হতে হয়। নূতন চিন্তাধারা ও মূল্যবোধগুলি স্পষ্টতই তার এখনও পর্যন্ত আয়ত্তে আসে নি।

কিন্তু এই সংঘর্ষের অন্তরালে ইংলণ্ডের গ্রামীন শ্রমজীবীশ্রেণীর যে চেহারা চোখে পড়ে তা সত্যিই মর্মান্তিক। তাদের আর্থিক দারিদ্র্য হয়তো কিছুটা দূর হয়েছে ; দু-একজনের ঘরে টেলিভিশন্ এসেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনাও দুর্বল হয়ে পড়েছে। শহরে শ্রমিকধর্মঘট হচ্ছে শুনে, তা ভেঙে দু-পয়সা বেশি রোজগার করার উৎসাহ প্রকাশ করতে জিমি দ্বিধা বোধ করে না। বিশ্বব্যাপী কি ঘটছে, সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন, ইত্যাদি সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকেও এরা আত্মসন্তুষ্ট। বীটির জ্ঞানাহরণের প্রচেষ্টাকে তাই এরা বিরূপ দৃষ্টিতে দেখে। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র, জনগণের ধনতন্ত্র ইত্যাদি মুখরোচক সংজ্ঞার্থের আড়ালে শ্রমিকসাধারণকে ক্রমশই একটা চিন্তাশূন্য অর্থরোজগারসর্বস্ব মানসিকতার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এদের এই সাংস্কৃতিক দারিদ্র্যের জন্য বিন্দুমাত্র লজ্জার অভাব, নিজেদের অজ্ঞতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অসচেতনতা, এ যুগের ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থ-সঞ্চালনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। অর্থপ্রাপ্তির আশায় উৎকোচের পরিবর্তে মানুষের চিন্তাশক্তিকে জড়পদার্থে পরিণত করার এ জাতীয় দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। কমিউনিস্টরা একটা জীবন-দর্শনে বিশ্বাসী ; তাই কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দাবীর সংগ্রামেই নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীতকলা—এক ব্যাপক জগতে তাদের আগ্রহ। ঠিক এই কারণেই পূর্ববর্তী নাটকের শুরুতে সেরা কাহ্নের সংসার ও পরিবেশকে যত জীবন্ত ও বহুমুখী বলে মনে হয়, 'রুট্স্'-এর বীটি ব্রায়ান্টের পরিবার তাদের পাশে ততই ম্লান ও নির্জীব হয়ে বিলীয়মান হয়ে পড়ে।

'রুট্স্'-এর অবিস্মরণীয়তা তার শেষাংশে। সারাদিন রনির আগমনের অপেক্ষায় তার সম্বর্ধনার প্রস্তুতির ব্যস্ততায় ক্লান্ত বীটি যখন রনির কাছ থেকে চিঠি পেয়ে জানতে পারে তাদের দুজনের সম্পর্ক আর স্থায়ী হবে না, তখন এ জাতীয় নাটকের চিরাচরিত পরিণতি অনুসারে আমরা আশা করি যে বীটি এবার ভেঙে পড়বে। কিন্তু বীটি সত্যানুসন্ধানের সংগ্রামে সৎ ও সাহসী। তাই চিঠিটা পড়ে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ এতদিনের নিরুদ্ধ সত্যটা তার কাছে আলোকিত হয়ে ওঠে। রনির সঙ্গে এযাবৎকালীন সম্পর্কটা নূতন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে দেখা দেয় : "He always

wanted me to help him but I never could....He gimme a book sometimes and I never bothered to read it....He used to beg me to discuss things but I never saw the point on it." রনির অপেক্ষায় উপস্থিত বীটির মা-বাবা, বোন, ভগ্নীপতি—প্রত্যেকেই ঘটনাটাকে অবধারিত ভেবে, বীটির উন্মাদিকতার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে মনে করে যারপরনাই আনন্দিত। তাকে সান্ত্বনা দিতে কেউই এগিয়ে আসে না। বীটি ক্লান্ত হয়ে বলে: "So you're proud on it? You sit there smug and you're proud that a daughter of yours wasn't able to help her boy-friend." তার উদাসীন আত্মীয়স্বজনকে ধিক্কার দিতে দিতে বীটি অনুভব করে: "কৃষক-পরিবারে জন্ম হলেও, আমার কোনো শেকড় নেই···পৃথিবীটা দুহাজার বছর ধরে বড় হয়ে উঠছে, অথচ আমরা কিছুই জানি না। আমরা নিজেরা কি, কোথা থেকে এসেছি—কিছুই জানি না।···Education cut only books and music—its asking questions all the time." প্রায় নিজের মনেই বীটি সংস্কৃতি, সুস্থ রুচিবোধ, এক কথায় চিন্তাশীলতার শেকড়ের অভাবের কথা বলে চলে। বলতে বলতে হঠাৎ কি যেন আবিষ্কার করে ফেলে বীটি। নিজের কথা যেন ও নিজে এই প্রথম শুনছে। চারিদিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে হেসে বলে—"শুনছ? শুনতে পাচ্ছ? আমি কথা বলছি। আমি কথা বলছি।" স্বর্গীয় কিছু যেন উন্মোচিত হয়েছে ওর সামনে, এই ভঙ্গিতে সে উদ্দীপ্ত হয়ে বলে ওঠে: "I'am not quoting no more···it's happening to me, I can feel it's happened, I'm beginning, on my own two feet—I'm beginning." রনির বচন-উদ্ধৃতির প্রয়োজন থেকে মুক্ত হয়ে, বীটির নিজের ভাষায় চিন্তা প্রকাশ করার ক্ষমতার জন্মলগ্নে, 'রুট্‌স্'-এর যবনিকাপাত। নাটকটির নাম হয়তো 'এক বুদ্ধিবাদীর জন্ম' দেওয়া যেত। কিন্তু 'রুট্‌স্' কথাটার মধ্যে একটা ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রয়েছে। বীটির আলোকপ্রাপ্তির পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল তার জীবনযাত্রার মূল শিকড়—তার পরিবার; অন্ধ চিন্তাশূন্য, আত্মসন্তুষ্ট ব্রায়াণ্ট পরিবার। বীটির নিজের ভাষায়: "It's not only the corn that need strong roots, you know, it's us too." তাই নাটকের বক্তব্যর সমস্ত প্রবণতাটা মানবজীবনের চিন্তাশক্তির এই শিকড়ের প্রয়োজনীয়তার উপরই গিয়ে পড়েছে।

নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে যে ত্রয়ীর মধ্যে 'রুট্‌স্' সর্বশ্রেষ্ঠ। নাটকটি স্পষ্টতই 'চিকেন্ স্যুপ উইথ বার্লি'র মতো প্রকাশ্য রাজনীতি সম্পর্কিত নয়। অবশ্য রাজনৈতিক চিন্তাটা বক্তব্যের অধঃস্রোতরূপে বয়ে চলেছে। বীটির সঙ্গে তার পরিবারের দ্বন্দ্বটা আসলে সমকালীন সমাজব্যবস্থাসৃষ্ট সমস্যারই রাজনৈতিক সমালোচনা। এর তুলনায় 'আইম্ টকিং অ্যাবাউট জেরুজালেম্' দুর্বল বলে মনে হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধাবসানের পরমুহূর্তেই ডেভ্ ও এডার গ্রামে সংসারস্থাপনের চেষ্টা ও বিফলতার কাহিনীই এ নাটকটির উপপাদ্য। গত শতাব্দীর ইংরেজ কবি উইলিয়ম মরিসের কায়িক শ্রমকে আনন্দদায়ক করে তোলার বাণী দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ডেভ্ স্বাধীন সূত্রধরের কাজ নিয়ে নিজেদের জেরুজালেম সৃষ্টি বা সমাজতন্ত্রকে বাস্তব ঘরোয়া রূপ দেবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে। সে ব্যর্থ হয় নানা কারণে—তার সঙ্গীদের ভগ্নোৎসাহকারী মনোভাব, নিজের অক্ষমতা এবং সর্বোপরি তার কর্মসূচীর অবাস্তবতা। 'চিকেন্ স্যুপ উইথ বার্লি'তে এডা, শহরের শ্রমশিল্পসমাজের মানবতাবিরোধী আবহাওয়ার বিরুদ্ধে যে তীব্র আক্রোশ প্রকাশ করেছিল, তার প্রতিধ্বনি এ নাটকের প্রতি ছত্রে পরিব্যাপ্ত। বক্তব্যে নূতনত্ব না থাকলেও সংলাপ-রচনায় ও চরিত্র-সৃষ্টিতে ওয়েস্কার তাঁর পূর্বেকার নৈপুণ্য বজায় রেখেছেন।

আর্নল্‌ড্‌ ওয়েস্কারের রাজনৈতিক মত জানি না। তবে স্পষ্টতই তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। তিনটি নাটকেই চরিত্রদের ব্যক্তিগত প্রবণতার সংঘর্ষে সমস্যার সৃষ্টি হলেও, তার অন্তরালে সর্বত্রই এক সর্বশক্তিমান সমাজ-ব্যবস্থা সর্বগ্রাসী দৈত্যের মতো বিরাজ করছে। 'রুট্‌স্'-এ ব্রায়াণ্ট পরিবারের অজ্ঞতা, রুচিহীনতা ও বীটির প্রতি সহানুভূতিশূন্য মনোভাব, এই ব্যবস্থারই হতভাগ্য পরিণাম। এদের চিত্রায়ণে, প্রচলিত মামুলি 'ভিলেন' রূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টাও যেমন নেই, দয়া-দাক্ষিণ্যের ভাবপ্রবণতায় সিক্ত করার অপচেষ্টাও তেমনি অনুপস্থিত। একটা নৈর্ব্যক্তিক বর্ণনাভঙ্গি লক্ষণীয়। পরস্পরবিরোধী ও সূক্ষ্ম পার্থক্যসম্পন্ন চরিত্রদের এই জাতীয় নিরাসক্ত অকপট বিশ্লেষণেই ওয়েস্কারের কৃতিত্ব। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একথা স্বীকার্য যে, চিরায়ত সাহিত্যের গভীর জীবনবোধ ও ব্যাপক জীবনদর্শনের অভিব্যক্তি ওয়েস্কারের নাটকে অনুপস্থিত; সমসাময়িক ইংলণ্ডের একটি বিশেষ শ্রেণীর কয়েকটি সমস্যার বিবরণমাত্র পাওয়া যায়। এ সমস্যাগুলি একটি দেশের বিশেষত্বরূপে

বর্ণিত হলেও, বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যসাধনের পথে সবচেয়ে ক্ষিপ্রগামী শক্তি হবে শ্রমিক-সাধারণের মননশীলতার উন্মীলন। লেনিনের কথাগুলি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য: "Without knowledge the workers are defenceless; with knowledge they are a force." সৎ বুদ্ধিবাদীতে রূপান্তরে বাধাগ্রস্ত হয়েই ডেভ্-এডা বর্তমান শ্রমশিল্প সমাজ থেকে পালিয়ে যায়, বীটি ব্রায়ান্ট তার পরিবার থেকে বিচ্যুত। এদের বৈশিষ্ট্য এরা কেউই শ্রেণীত্যাগী, আদর্শচ্যুত হয়ে উচ্চশ্রেণীতে প্রবেশাধিকারলাভে ব্যগ্র নয়, যেমন আকাঙ্ক্ষী 'অ্যাংগ্রি ইয়ং মেন'দের উপন্যাস-নাটকের চরিত্ররা। ডেভ্ গ্রামে গিয়ে স্বাধীন শ্রমজীবী হবার চেষ্টা করে; ব্যর্থ হয়ে সে ফিরে আসে স্বসমাজে। অবশ্য শ্রেণী-সংগ্রামে উদাসীন হয়ে নিছক বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার বিপদ সম্পর্কেও ওয়েস্কার সচেতন। তাই 'রুট্স্'-এ অনুপস্থিত রনির চিঠিতে তার আত্ম-সমালোচনা হৃদয়ঙ্গমযোগ্য: "If I were a healthy human being it might have been alright but most of us intellectuals are pretty sick and neurotic···and we couldn't build a world even if we were given the reins of government." সুতরাং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে লালিত আধুনিক শ্রমশিল্প সমাজের বিরুদ্ধে আক্রমণকে ওয়েস্কার গান্ধীবাদী বর্জনের পর্যায়ে নিয়ে যেতে অনিচ্ছুক; তার মননবিরোধী ও বুদ্ধিনিরোধক মূল্যবোধের বিপক্ষে সুস্থ যুক্তিনির্ভরশীলতা সৃষ্টির চেষ্টাতেই নাটকের চরিত্ররা সংগ্রামে ব্রতী। অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের আন্দোলন থেকে এ সংগ্রাম স্বতন্ত্র হতে পারে না; বরং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপক প্রচেষ্টারই একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলে তা পরিগণিত হওয়া উচিত।

তবুও, একদিকে রনি, ডেভ্ ও এডার দ্বিধা-সন্দেহ ও যুক্তিনির্ভর প্রশ্ন, যাতে আমাদের নিজেদের কোনো কোনো সময়ের হতাশা ভাষা পায়, আর অন্যদিকে অভিজ্ঞতায় জর্জরিতা বৃদ্ধা সেরার অবিচলিত, সন্দেহ-উদাসীন আদর্শানুরক্তি—এই উভয়পক্ষেই আমাদের সহানুভূতির পাল্লা দোদুল্যমান। কারণ এদের দৃষ্টিভঙ্গি পরস্পরবিরুদ্ধ বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হলেও, আসলে পরস্পর-পরিপূরক। বিশ্বাসশক্তির স্থৈর্য ও যুক্তিপ্রদর্শনের সাহসের সমন্বয়েই আধুনিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্যের আশ্বাস নিহিত রয়েছে। তাই 'আইম্ টকিং অ্যাবাউট জেরুজালেম্'-এ ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের অন্তিম পর্যায়ে

দাঁড়িয়েও ওয়েস্কারের চরিত্ররা সমাজতন্ত্রে স্থিরবিশ্বাসী। রনি তার বাবার কথা স্মরণ করে বলে: "The difference between capitalism and socialism, he used to say was that capitalism contained the seeds of its own destruction, but socialism contained the seeds of its own purification." ওয়েস্কারের তিনটি নাটকে বর্ণিত নানা হতাশা, দ্বন্দ্ব, দ্বিধা-সঙ্কোচের মধ্যে এই আশার বাণীটিই একমাত্র আলোক যা মোহভঙ্গকেও সত্যাকৃতিতে রূপান্তরে সক্ষম।

The Wesker Trilogy. Arnold Wesker. Jonathan Cape. London. 21/s.

শুধু ফুল

কৃষণ চন্দর

—কি ধরনের ঘর ভাই তোমার? বাড়িভাড়ার দালাল আমাকে জিজ্ঞেস করল। সে "তুমি" সম্বোধন করল আমার নোংরা পা-জামার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে।

—আমি এমন একটা ঘর চাই যাতে ঘর একটি হলেও তার সঙ্গে যেন আলাদা একটা বাথরুম থাকে। আর সেই ঘরের সামনে যেন সবুজ ঘাসে ভরা আঙিনা থাকে। এবং সেই সবুজ ঘাসকে ঘিরে থাকে ফুলগাছ। সেই আঙিনার মাঝে এমন একটি জায়গা থাকে যেখানে বসে রোদ পোহানো যায়। সেই সবুজ ঘাসের ওপর মাঝে-মাঝে যদি কোনো সুন্দরীকে বসতে দেখি তাহলে ভালোই হয়।

আমার পছন্দসই বাড়ির একটি ছবি তুলে ধরলাম।

—মশাই, বাসাবাড়ির খোঁজ না করে নিজের বুদ্ধির ইনসিওর আগে করান।

লোকটা খুব সমঝদার মনে হচ্ছে। আড়চোখে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে একবার দেখে নিলাম ওকে।

দালাল আমার কাছে এসে আস্তে বলল, ভাড়া কত দেবে?

—পঁচিশ টাকা।

—পঁচিশ টাকা! বলেই লোকটা হাঁচি ফেলে আবার বলল, পঁচিশ টাকায় শুধু ঐ ঘাস পাবেন, বাড়ি নয়।

—বাড়ি খোঁজার জন্য তোমাকে দৈনিক তিন টাকা করে দিচ্ছি। এই ধরনের কথা এখন বলা তোমার উচিত হয়নি! আর কোনো কথা না বলে চলো বাড়িগুলো দেখাবে।

দালালটি তিন টাকার দড়িতে বাঁধা। তাই আমার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে টাট্টু ঘোড়ার মতো হাঁটতে আরম্ভ করে দিল। ভাবলাম, প্রত্যেক মানুষের গলায় দড়ি বাঁধা আছে। তিন টাকার দড়ি অথবা তিনশো বা

তিন হাজার বা তিন লাখের। যে দামেরই হোক না কেন দড়ি একটা বাঁধা আছে। সত্যি কথা বলতে কি আমি একটা দড়ি খুঁজছি, তবে মোটা টাকার দড়ি নয়, খুঁজছি গলায় দেওয়ার জন্য। আমি সিদ্ধান্ত করে ফেলেছি আত্মহত্যা করার। হাঁটার সময় মন আমাকে প্রশ্ন করল, মরবেই ঠিক করলে যখন তখন আর বাসা খুঁজছ কেন? কিসের প্রয়োজনে?

আমি মনকে বললাম, দেখ, এ-ব্যাপারে তুমি নাক গলিওনা। তোমার জন্যেই আজ আমার এই দশা। তোমারই জন্যে আমি এক বাজে প্রেমিকার পেছনে ছুটেছি···তোমারই জন্যে আমি একটা বাজে চাকরি গ্রহণ করেছি··· তোমার কথা শুনে চলাতেই আমার ভাগ্যে জুটেছে কয়েকটা অপদার্থ বন্ধু··· সারা জীবন তুমি আমাকে ভুল পথে চালিত করলে। তাই বলে দিচ্ছি আজ তোমার কোনো অধিকার নেই আমার এ-ব্যাপারে নাক গলানোর। কে তুমি? কি অধিকার আছে তোমার আমাকে উপদেশ দেওয়ার।

—কই আমি তো কোনো কথা বলিনি তোমাকে। মন আবার বলল, শান্তভাবে শুধু একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই যে মরবেই যখন ঘরের কী দরকার? একটা পিস্তল যোগাড় করলেই তো পারো। তাছাড়া নদী-খাল-বিল-রেলগাড়ি-বিষ এসব তো আছেই।

—তুমি একটি আস্ত আহাম্মক। তুমি আজও আমাকে চিনলে না। আমার মতো মানুষ কি কখনও একটা সাধারণ অথচ সস্তাধরণের মৃত্যুবরণ করতে পারে! আমি মরতে চাই সানন্দে, সুন্দর পরিবেশে। একটি পরিপাটী করা ঘর···নীলাভ আলোতে ঘরটা থাকবে স্বপ্নময়। ওপরের ফ্যানটা ঘুরবে। শুধু আমার মৃত্যু মুহূর্তে ফ্যানটা বন্ধ করব আর তাতে দড়ি বেঁধে ঝুলব। মৃত্যুর শেষ মুহূর্তেও জানলা দিয়ে যেন দেখতে পাই আঙিনা, কচি কচি ঘাস, ঘাসের আলিম্পনকে ঘিরে নানান রঙের ফুল। রোদ পোয়ানোর জায়গাটা। আর সেই মুহূর্তেই যদি দেখতে পাই পাশের বাড়ির সুন্দরী তন্বী তার রেশমী-কালো চুল এলিয়ে রোদ পোয়াচ্ছে তখন নিশ্চয়ই বেশ লাগবে আমার।

—ওমা! রাত্রে রোদ কোথায় পাবে! তাছাড়া সেই অন্ধকার মাঝ-রাতে সুন্দরীই বা আঙিনায় বসে থাকবে কেন তোমার জন্যে?

—তাহলে আমি দিনেই আত্মহত্যা করব। আমি যাই করি ইউ টু-ডেট।

মন চুপ করে গেল। ততক্ষণে একটি বাড়ির কাছে পৌছে গেছি। বেশ চমৎকার বাড়ি। গোল একটি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম একটি সুন্দর ঘরে। প্রত্যেকটি দরজা-জানলার রঙ মনোরম। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রঙের কারিগর যেন তার প্রাণের রঙ দিয়ে রাঙিয়ে তুলেছে এই ঘরটাকে। পাশেই আর একটি ঘর। দরজা-জানলা সব নাকি সেগুন কাঠের। দালাল আমাকে বলে দিল দুটো ঘর পাশাপাশি। একটা আমার জন্যে আর একটা বউয়ের জন্যে। বউ! বিয়ের পরে দিন কয়েক যাকে স্বামীরা সব সময় ঘিরে থাকে তারপর সারা জীবন ঝগড়া ঝাঁটিতে কাটে। জীবন সেখানে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভেংচি কাটে। খাটে বিছানা পাতা আছে। বা! ঘরের একটি দরজা খুললেই সোজা বাথরুমে যাওয়া যায়। বাথরুম বটে! আরশির খেলা। মনে হয় এটি যেন দিনের পর দিন বসে উপন্যাস পড়ার জন্যে করা হয়েছে। মনে মনে বললাম, চমৎকার। আত্মহত্যার পক্ষে এর চেয়ে সুন্দর ঘর আর হয় না। তারপর তাড়াতাড়ি দালালের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাড়া কত?

—চারশো টাকা!

মুখটা আমার ঘোড়ার মুখের মতো লম্বা হয়ে গেল। দারুণ চটে গিয়ে বললাম, গবেট কোথাকার! আমি তো তোমাকে পঁচিশটাকার বাসা খুঁজতে বলেছি।

দালালটি আমাকে কোনো কথা না বলে যত তাড়াতাড়ি পারল সিঁড়ি বেয়ে নেমে নিচে দাঁড়াল।

দালালটি তারপরে যে-বাড়ি দেখাল সেটাও ভালো। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। আলো বাতাস আছে। বাথরুম, রান্নাঘর, বারান্দা এবং আঙিনায় ভরে আছে সবুজ ঘাস।

—ফুল গাছ কোথায়?

—ফুল গাছ তুমি লাগিয়ে নিতে পার। রোদপোয়ানোর ব্যবস্থাও হতে পারে টাকা ঢাললে। তারপর আপনি বউকে পাশে বসিয়ে রোদ পোয়াবেন। আর কি বলবে

—ফুল গাছ লাগানোর মতো অত সময় নেই আমার। বউ যদি থাকত বউকে পাশে বসিয়ে রোদ পোয়াব?…আরে মিঞা! আমি যে কারো আমার তাহলে কি আগে রান্নাঘর খুঁজতাম না! যাক, আমি যে কারো জন্য ঘর খুঁজছি সেটা হয়তো এই ঘরেও হতে পারে। আঙিনায় আমি না

হয় কয়েকটা ফুল গাছের টব রেখে দেব। রোদপোয়ানোর একটা মামুলি ব্যবস্থাও করব। শেষ পর্যন্ত এক সুন্দরীর বসে থাকাও না হয় কল্পনা করে নেব। ভালো কথা, ভাড়া কত?

—আড়াই শো টাকা।

—মূর্খ কোথাকার। আড়াই শো টাকার বাড়ি দেখাচ্ছ কেন? আমি তো শুধু পঁচিশ টাকারটা চাই।

দালাল নিরুত্তর রইল। মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তৃতীয় যে ঘরটি আমাকে দেখাল সেখানে প্রথমেই পরে বাথরুম তারপর সিঁড়িতে উঠে পাই একটি ঘর। তারপাশে রান্নাঘর। যদিও বাথরুমটা তার পাশেই হওয়া উচিত ছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, এই অঞ্চলে যতগুলো বাড়ি আছে তার প্রত্যেকটাতেই এই অবস্থা। ঘরের পাশেই কিচেন, আর নিচের তলায় বাথরুম।

—কারণটা কি?

—কারণ হল বউ রান্নাঘর থেকেই যাতে বাথরুম, শোয়ার ঘর ও সিঁড়ি দেখতে পায়।

—ভাগ্যিস আমি একটি বউ পুষিনি। আমি কিন্তু কারোর চাউনিকে ভয় করিনা। রান্নাঘর ও বাথরুমে আমার অত দরকার কিসের। আমি না হয় বাথরুমের কাজটা রান্নাঘরেই সারব। দুটোই আমার কাছে সমান।

—ওসব তুমি আর এ-বাড়ির মালিক বুঝবে। বাড়িটা যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে একশটি টাকা বের করো।

—আবার একশ টাকা কিসের।

বিরক্ত হয়ে সে বলল, একশ টাকা, মানে এক মাসের ভাড়া।

—ওরে বাবা! আমি হাত জোড় করে বললাম, আমি তোমার কাছে শুধু পঁচিশ টাকা ভাড়ার একটি ঘর চাইছি। তুমি আমাকে এত ঘোরাচ্ছ কেন?

—আমার কাজ বাড়ি দেখানো। কি করে জানব শেষ পর্যন্ত আপনার কোনটা পছন্দ হবে। আমার তো একটা অভিজ্ঞতা আছে। দেখছি তো পঁচিশ টাকা ভাড়ার বাড়ি খুঁজতে গিয়ে লোকে পছন্দ করে চারশো টাকার

ঘর, আর তাতেই থাকে। আবার চারশো টাকার বাড়ি খুঁজতে বেরিয়ে পঁচিশ টাকার বাড়িতেই আস্তানা গাড়ে। ভাড়াটিয়াদের মন বোঝা ভার।

এরপর দালাল আমাকে যে-বাড়িটি দেখাল সেটি পাঁচতলা-জাহাজের মতো দেখতে। বাড়িটার ওপরে জাহাজের ছবি আছে, লেখা আছে এস. এন. আত্মারাম মুলতানী। এ-বাড়ির ভেতরে মাংস, পেঁয়াজ এবং মদ খাওয়া নিষেধ।

—বউকে নিয়ে শোওয়া নিষেধ নয়তো ?

দালাল আশ্চর্য হয়ে তাকাল আমার দিকে। আমি বলে গেলাম, এখানে হয়তো চিন্তা করাও বারণ। আকাশের দিকে তাকানো, সশব্দে খিল আঁটা, বিছানায় পা ছড়িয়ে শুয়েশুয়ে সিগারেট টানা, কাঁধে তোয়ালে ফেলে দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে ব্রাশ করতে করতে কোনো যুবতীর দিকে তাকানো—এ সবই হয়তো নিষেধ। মশাই, আমি একটি ভালো বাসা খুঁজতে বেরিয়েছি। বিনোবা ভাবের আশ্রমে ঢুকতে নয়। কথাগুলো বলতে বলতে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। দালাল লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে আমার পেছন পেছন হাঁটতে লাগল।

এরপর দালালটা আমাকে যে-ঘর দেখাল তা দেখে সত্যিই মনে হল বাসাটার ভাড়া পঁচিশ টাকা। শুধু একটি ঘর।

বারান্দা নেই, ঘাস নেই, ফুল নেই। ঘরটা চারতলায়। খিড়কির রড-গুলো মোটা। বাড়িওয়ালাকে ফাঁকি দিয়ে জানলা টপকে পালানোর উপায় নেই। দরজা দেখে মনে হয় তিরিশ বছর আগে একবার রঙ করা হয়েছিল, এখন সে-রঙের কোনো চিহ্ন নেই। আশ্চর্য, একটি পাখা ঝুলছে। আমি আমার কল্পনায় যে বাসাটির ছবি এঁকেছিলাম তার থেকে আঙিনা-ঘাস-ফুল এবং সুন্দরীর ছবি ছেঁটে ফেললাম। আমার ইচ্ছাপূরণের জন্য শুধু একটি পাখাই যথেষ্ট। ঠিক করলাম এই ঘরটাই নিয়ে নেব।

—কিন্তু বাথরুম কোথায় ?

—ঐ পাশে আছে। এক কোনের দিকে তর্জনী দেখাল।

আমি তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে দেখি সেখানে রয়েছে একটি মুটকী। তার চোখগুলো বড় বড়। সবেমাত্র কেউ যেন পাঁক থেকে তুলে এনেছে। পান খেয়ে খেয়ে দাঁতের রঙ বদলে ফেলেছে। ঠোঁট ঘোড়ার

ঠোঁটের মতো পুরু। আমি তাড়াতাড়ি পিছিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় শুনতে পেলাম, নতুন ভাড়াটে মনে হচ্ছে তোমাকে।

—মনে হচ্ছে কিনা জানিনা। আমি বাথরুমের দরজাটা খুঁজছি। আচ্ছা, এই বাথরুমটা কার ? আপনার না আমার ?

—এটা আমাদের দুজনেরই। তোমার এবং আমার।

"তোমার এবং আমার" কথাটা সে এমন ভাবে বলল যেন আমরা পরস্পরের জনম-জনমকে সাথী। সারাজীবনের জন্য আমার সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক সেই মুহূর্তেই পাতানো হয়ে গেল। আমি ঘাবড়ে গিয়ে আরো দুপা পেছিয়ে গেলাম। সেও এগিয়ে এসে বলল, চলে এস, ভাবনার কিছু নেই। দুজনেই মিলেমিশে কোনো ভাবে কাজ চালিয়ে নেব।

তারপর সে আমার দিকে তাকিয়ে এমন ভাবে হাসল যেন মুরগীকে কেটে তার ছটফটানি দেখে কসাই হাসছে। আমি তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম দরজার কাছে। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দালালকে বললাম, এটাও পঞ্চাশ টাকা ভাড়া। দেখ, আমাকে যদি পঁচিশ টাকা ভাড়ার ঘর না দেখাতে পারো তাহলে আমার তিনটাকা ফেরৎ দাও।

—ভদ্র পাড়ায় পঁচিশ টাকার ঘর পাওয়া যায় না। দুর্গন্ধ বস্তিতে থাকতে রাজি থাক তো বলো পঁচিশ টাকার মধ্যে একটি ঘর পাইয়ে দিচ্ছি।

—চলো আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই। তাড়াতাড়ি ঘর দেখাও।

তারপর সে আমাকে নিয়ে গেল একটি নোংরা বস্তিতে। সেখানকার গলিতে সূর্যের আলো ঢোকে না। সেই বস্তিতে নিয়ে গিয়ে দুর্গন্ধী-বস্তির দালালের সঙ্গে আড়ালে দু-চার কথা বলে নিল। তারপর ওরা দুজনে আমার কাছে ফিরে এল। আমার দালাল বলল, এ-লোকটা যে বলছে পঁচিশ টাকার ঘর বস্তিতে পাওয়া যায় না।

—তাহলে কত টাকার পাওয়া যাবে ?

—ষোল টাকার আছে। তার চেয়ে বেশি টাকার ঘর নেই।

—তাহলে ষোল টাকারটাই দেখাও।

—ষোল টাকার ঘরও বেশি নেই, মাত্র একটি আছে। কিন্তু সে ঘরটা তোমার মনের মতো নয়।

—কেন নয় ? আমি বস্তির দালালের দিকে তাকিয়ে বললাম।

নোংরা বস্তির দালাল থুতনী নেড়ে বলল, বাবু, ঐ ঘরের ভাড়াটে কালকেই মারা গেছে।

—তাহলে তো ভালোই হল, ঘরটা তো খালি হয়ে গেছে।

—তা খালি হয়েছে বাবু। দুর্গন্ধী বস্তির দালাল মুখে খৈনী পুরে বলল। কিন্তু ভাড়াটে যে আমাদের মতোই একজন গরিব মজুর ছিল। চুড়ি তৈরির কারখানায় কাজ করত।

—মজুর ছিল তাতে ক্ষতি কি। চুড়ি তৈরি করত কিন্তু চুরি তো আর করত না।

—না বাবু, সেকথা নয়। দুর্গন্ধী বস্তির দালাল নিজের কোমর চুলকোতে চুলকোতে বলল, চুড়ি তৈরির মজুর ছিল বটে।...কিন্তু ওর যে ওই ফুঁ দিতে দিতে বুকের একটা রোগ হয়েছিল। খুব খারাপ রোগ।

—তাতে কী হয়েছে? প্রত্যেক মানুষই কোনো না কোনো অসুখে পড়ে। এখন প্রত্যেক অসুখেরই পেছনে একটা কারণ থাকে। কারও ফুঁ দিলে অসুখ করে আবার কারও অতিরিক্ত খাবার খেয়ে।

—তুমি ঠিক বুঝতে পারছনা বাবু। বস্তির দালাল চুলকোতে চুলকোতে বলল, ব্যাপারটা হল লোকটা পাঁচ বছর ধরে এই অসুখে ভুগছিল। রোগে ধুঁকে ধুঁকে কাজ করত। ওর বাঁচার বড্ড সাধ ছিল আর ছিল একটা বউ চারটে ছেলেমেয়ে। ও মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘর খালি করিয়ে নেওয়া হল, কারণ ওর বউ আর ছেলেমেয়েদের মাসে ষোল টাকার মতো ঘর ভাড়া দেওয়ার অবস্থা ছিল না। ওরা এখন এর চেয়ে খারাপ একটা বস্তিতে চলে গেছে, সেখানে ভিখিরি আর টাঙ্গাওয়ালারা থাকে। তাই বলছিলাম এই ঘর তোমার উপযুক্ত নয়।

ছোট্ট একটা ঘর। দরজাটা নড়ছে। জানলাগুলো কালো হয়ে গেছে ধোঁয়ায়। জলের কল দিয়ে যে জল পড়ছে তার রঙ ইটের গুঁড়োর মতো। নলের মুখ দিয়ে খুব পাতলা করে জল পড়ছে। ঘরের ভেতর হঠাৎ একটা গোলাপ ফুলের টব দেখতে পেলাম।

—একি, এখানে গোলাপ গাছ!

নোংরা বস্তির দালাল তার হলদে রঙের দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, বাবু এই টবটা তোমার জন্যে।

—আমার জন্যে! আকাশ থেকে যেন পড়লাম।

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। লোকটা তো আমার সামনেই মারা গেছে। মরার সময় আমাকে শেষ কথা বলে গেছে—এ-ঘরে নতুন ভাড়াটে যে আসবে তাকে এই টবটা দিয়ে বলো, প্রত্যেক দিন যেন একটু জল দেয় যাতে এই গোলাপ গাছটা বেঁচে থাকে···লোকটা পাগল ছিল বাবু!

তৎক্ষণাৎ আমার মস্তিষ্কে যেন প্রচণ্ড একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেল, বুকে আমার প্রচণ্ড একটা শব্দ হল। ঘরের কোণে পড়ে আছে একটি গোলাপ ফুল। দৃষ্টি নিবদ্ধ হল সেই ফুলের ওপর। ঘর আর ঘরের বাইরে চারিদিকেই রয়েছে নোংরা এবং অন্ধকার। অন্ধকার আর নৈরাশ্য। তার মাঝে শুধু একটি গোলাপ। মৃত্যুর সময়, ক্ষুধার সময়, জঘন্য অসহনীয় পরিবেশে, এই দরিদ্র মানুষের পরিবেশে—একটি গোলাপ। যেখানকার ঘরগুলোর ইটে নোনা ধরে খসে পড়ছে, যেখানে রঙের কোনো বাহার নেই, সেখানে মাত্র একটি গোলাপ।

আমি ওই ঘরটাই ভাড়া নিয়ে নিলাম। আজো সেখানে আছি।

মূল উর্দু থেকে অনুবাদ: **বোম্মানা বিশ্বনাথম**

সাহিত্যে ধর্মচেতনা

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

কে কখন পৃথিবীর কোন্ দেশে সর্বপ্রথম সাহিত্য রচনা করেছিলেন এবং তাঁর আত্মচেতনার স্বচ্ছতায় মানবজীবন কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল একথা ঠিক নির্ভুলভাবে বলা যেতে না পারলেও একটা কথা আমরা সকলেই নিঃসংশয়ে বলতে পারি, তিনি জীবন ও জগতের বিভিন্ন ঘটনা ও বস্তুগুলিকে অতিপ্রাকৃতের চিন্তা বা কল্পনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃত নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পার্থিব মূল্যে সমৃদ্ধ এক একটি পৃথক সত্তারূপে দেখবার প্রয়াসকে প্রশ্রয় দেবার মতো মানসিক দৃঢ়তা ও বুদ্ধিগত সামর্থ তখন লাভ করতে পারেন নি। পৃথিবীর সকল দেশের প্রাচীন সাহিত্যই আকারগত অথবা বস্তুগত উপাদানের দিক থেকে মূলত ধর্মনির্ভর। সাহিত্য সাধনার আদিযুগে কোনো সাহিত্যিকই তাঁর জীবনচেতনার বা সমাজচেতনার গভীরে ধর্মচেতনার অবাধ এবং অসংযত অনুপ্রবেশকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারেন নি। যে-যুগে জীবনের ভালোমন্দকে দেবদেবীর ইচ্ছাধীন বলে মনে করে ও যে কোনো প্রাকৃতিক বস্তু বা ঘটনার পেছনে এক উদ্ধত অতিপ্রাকৃত শক্তির ক্রিয়াশীল অস্তিত্বের কল্পনা করে মানুষ তৃপ্তি পেত, সে যুগে সাহিত্যিকদের কাছ থেকে ধর্মনিরপেক্ষ এক স্বতন্ত্র জীবনানুভূতির আশা করা হয়তো সম্পূর্ণ বৃথা।

প্রাচীন সাহিত্য প্রধানত ধর্মনির্ভর হলেও ভাববস্তুর দিক থেকে তাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। এক শ্রেণীর ধর্মনির্ভর সাহিত্য আছে যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনী বা চরিত্রকে অবলম্বন করে তার মাধ্যমে ধর্ম-অধর্ম বা পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্বকে পরিস্ফুট করে তোলা এবং পরিশেষে ধর্মের হাতে অধর্মের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটানো। আমাদের দেশের 'রামায়ণ' 'মহাভারত', হোমারের 'ইলিয়াড' 'ওডেসি', মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট' ও 'প্যারাডাইস রিগেইন্ড' প্রভৃতি কাব্য ও মহাকাব্যগুলি সাহিত্যে ধর্মনির্ভরতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে স্বচ্ছন্দে পরিগণিত হতে পারে।

মহাকাব্যেই দেখা যায়, ঐতিহাসিক ও সামাজিক তথ্যাবলীর সমস্ত বাস্তবতা ও মানুষের অপরাজেয় পৌরুষের সমস্ত লৌকিক সত্যতাকে এক অলৌকিক মায়াজালে আচ্ছন্ন ও অবলুপ্ত করে দিয়ে কতকগুলি দুরন্ত পৌরাণিক দেবতা বা উপদেবতা পাতায় পাতায় আধিপত্য করেছে এবং তাদের এই অবাঞ্ছিত অশোভন আধিপত্যের দ্বারা কাব্যরসকে রীতিমত ক্ষুণ্ণ করেছে। মিল্টনের 'প্যারাডাইস রিগেইন্ড'-এ শয়তানের সঙ্গে খ্রীস্টের যুদ্ধ নিতান্ত হাস্যকর। 'মহাভারত'-এ ধর্মের ধ্বজাধারী কূচক্রী কৃষ্ণের কুটিল ইঙ্গিতে কর্ণ, দুর্যোধনের মতো বীরদের পতন ও পরাজয় মর্মবিদারক। হোমারের 'ইলিয়াড'-এ প্যারিস ও হেলেনের প্রেমাবেগ বিশুদ্ধ ও স্বতোৎসারিত হওয়া সত্ত্বেও তাতে শুধু ধর্মের সম্মতি না থাকার ফলে তা ট্রোজনদের শোচনীয় ধ্বংসের কারণ হওয়াটা লেখকের সমকালীন ধর্মবোধ ও নগ্ন নীতি-চেতনারই পরিচায়ক। আবার কতকগুলি ধর্মমূলক সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য হল, ধর্ম-অধর্মের কোনো দ্বন্দ্বের উপস্থাপনা না করেই কোনো এক বিশেষ ধর্ম বা দেবদেবীর জয়গান করা। ভারতের বিরাট বৈদিক সাহিত্য, বাংলার বৌদ্ধ চর্যাপদ, নাথগীতিকা, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব কবিতা ও শাক্ত পদাবলী, ইংলণ্ডের এ্যাংলো-স্যাকসন যুগের যাবতীয় কবিতা, খ্রীষ্টীয় নবম শতকের জর্মান কবিতা প্রভৃতি এই ধরনের সাহিত্যের নিদর্শন।

আর এক শ্রেণীর ধর্মমূলক সাহিত্য আছে যারা যে কোনো রকমের স্থূল ধর্মনির্ভরতাকে কৌশলে পরিহার করে অতি সূক্ষ্মভাবে ধর্মকে প্রতীকরূপে প্রয়োগ করে তার মাধ্যমে স্বতন্ত্র এক বক্তব্যকে ব্যঞ্জিত করে তুলতে চেয়েছেন। দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' ও চসারের 'ক্যান্টারবেরি টেল্স্'কে এই শ্রেণীর সাহিত্য হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। Inferno, Purgatorio ও Paradiso নামে তিনটি ভাগে বিভক্ত এই রূপকধর্মী মহাকাব্যে দান্তে মৃত্যুর পর মানবাত্মার সমুচিত শাস্তি ও অনুশোচনার বিভিন্ন স্তরভেদ করে স্বর্গের পথে কাল্পনিক অধিগমণকেই বাণীরূপ দান করেছেন। দান্তে কল্পনা করেছেন, উত্তর গোলার্ধের নিচে অবস্থিত ও ভূগর্ভের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত প্রসারিত নরক হচ্ছে ফানেলের মতো ও মুখওয়ালা এমন এক বিশাল গর্ত যেখানে মৃত্যুর পর মানবাত্মারা অবস্থান করে। কিন্তু রূপকের দিক থেকে বিচার করলে এই নরক প্রতিটি মানবাত্মারই গভীরে অবস্থিত পঙ্কিল কামনা বাসনায় পূর্ণ এক একটি পাপের অন্ধকার গর্ভ যেখানে মানুষ স্বেচ্ছায় নিজেকে নিক্ষেপ

করে। দান্তে কল্পিত 'পারগেটারিও' হচ্ছে দক্ষিণ গোলার্ধের কোনো এক দ্বীপে অবস্থিত এক বিশাল পর্বতের উপর এমন এক স্থান যেখানে মৃত্যুর পর একমাত্র অনুতপ্ত আত্মারাই অবস্থান করে। আসলে কিন্তু পারগেটারিও হচ্ছে মানবমনের সেই সমুন্নত স্তর যেখানে মানুষ আপন পাপকর্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এক তীব্র অনুতাপের আগুনে তিলে তিলে দগ্ধ হয়। তারপর পরিশেষে দান্তে মধ্যযুগীয় জ্যোতির্বিদদের মতো দশটি স্বর্গের কল্পনা করেছেন। "From the thraldom of this corruption to the liberty of eternal glory" অর্থাৎ দুর্নীতিপরায়ণ এবং পাপ-জগতের বন্ধন হতে অনন্ত মুক্তির চিরন্তন গৌরবের রাজ্যে অধিষ্ঠিত হবার পর মানবাত্মা যে স্বর্গসুখ লাভ করে তার তারতম্য অনুসারে দশটি স্তর আছে। ক্রমোন্নতির মধ্য দিয়ে একে একে সব স্তর ভেদ করে তবে আত্মা পরম আনন্দ লাভ করে। দান্তে নিজেই এই মহাকাব্যের নায়ক, খ্রীষ্টীয় পাপচেতনাসম্পন্ন প্রতিটি মানবাত্মার মূর্ত প্রতীক-রূপে শয়তান-শাসিত ভুলের ভয়ানক অরণ্য থেকে ঈশ্বর-শাসিত সেই পরম সুখের স্বর্গরাজ্যের পথে অক্লান্ত অভিসারে এগিয়ে চলেছে। এই কাব্যে প্রসিদ্ধ ল্যাটিন কবি ভাজিলকে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দান করেছেন দান্তে। এখানে ভাজিল হচ্ছেন মানুষের সেই পরিপূর্ণ জ্ঞানসত্তা ও শিল্পসত্তার প্রতীক যে জ্ঞান ও শিল্পপ্রতিভা মানুষ ঈশ্বরের করুণা ব্যতিরেকেই নিজের স্বাধীন চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা লাভ করে। কিন্তু দান্তের মতে শিল্প ও দর্শন যত বড়ই হোক না কেন তা কখনো ধর্মের সমপর্যায়ে উন্নীত হবার গৌরব লাভ করতে পারে না। এই জ্ঞান ও প্রতিভা ঈশ্বরানুভূতির সঙ্গে সার্থক-ভাবে সংমিশ্রিত নয় বলেই মানুষকে তা স্বর্গলাভের অধিকারী করে তুলতে পারে না। কাব্যে তাই ভাজিল স্বর্গপথের পথিক হয়েও স্বর্গে প্রবেশ করতে পারেন না ; তবে তিনি মৃত আত্মাগুলিকে আপন আপন পাপকর্মের প্রতি সচেতন করে দিয়ে তাদের আত্মোপলব্ধিতে সহায়তা করেছেন প্রচুর। এইভাবে দেখা যায় 'ডিভাইন কমেডি'র প্রতিটি চরিত্র ও ঘটনার অন্তরালে এক একটি রূপকাত্মক অর্থ অতি সুন্দরভাবে আত্মগোপন করে আছে। Can Grande della Scala নামক একজন অনুরাগী পাঠককে লেখা একখানি চিঠিতে দান্তে নিজে একথা স্বীকার করে গেছেন :

"The subject of the whole work, then, taken merely in the literal sense is "the state of the soul after death straight-

forwardly affirmed", for the development of the whole work hinges on and about that. But if, indeed, the work is taken allegorically its subject is : "Man, as by good or ill deserts, in the exercise of his free choice, he becomes liable to rewarding or punishing justice". মানুষের ইচ্ছাশক্তি মূলতঃ স্বাধীন। দান্তের মতে এই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের উপরেই নির্ভর করছে তার পাপপুণ্য।

জিওফ্রী চসারের 'ক্যান্টারবেরি টেল্‌স'-এর নামকরণের মধ্যে যে ধর্ম-শক্তিতার আভাস পাওয়া যায় কাহিনীর মধ্যে কোথাও সে আভাস সত্যমূর্তি লাভ করবার সুযোগ পায়নি কখনো। সমসাময়িক ইতালীর কবি ও কথা-সাহিত্যিক বোকাশিওর 'দি দেকামেরন' থেকে গল্প বলার এই অভিনব রীতি সম্পর্কে বিশেষ প্রেরণা লাভ করলেও এখানে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের প্রভূত পরিচয় দিয়েছেন চসার। তাছাড়া গল্প বলতে গিয়ে শুরুতে মানবজীবনের সমস্ত আশা আকাংক্ষা ঈশ্বরের উপর নিঃশেষে ছেড়ে দিয়ে যে ঈশ্বর প্রশস্তি গেয়েছেন বোকাশিও, তা কাহিনীর সাহিত্যরসের দানা বাঁধার পথে একান্ত প্রতিবন্ধক। সাহিত্যে ভক্তিরসের কোনো স্থান নেই ; তাই তাকে অন্য কোনো রসের আশ্রয়ে সাহিত্যে প্রবেশ করতে হয়। কিন্তু বোকাশিও প্রথমেই ভক্তিভাবের উচ্ছ্বসিত প্রাবল্যে ফেটে পড়েছেন।

"Ladies, it is most meet and right, that everything we do, should be begun in the name of Him who is the maker of all things. Certain it is, that all earthly things are transitory and mortal ; attended with great troubles, and subject to infinite dangers which we who live embroiled with them and are even part to them, could neither endure, nor find a remedy for, were it not for the especial grace of God that enables us." (The Decameron, Novel I)

বোকাশিওর এই উগ্র ও অত্যধিক ঈশ্বরনির্ভরতা কিন্তু চসারের 'ক্যান্টারবেরি টেল্‌স'-এর মধ্যে একেবারে নিরুক্ত ও নিরুচ্চার। এখানে লণ্ডন থেকে ক্যান্টারবেরির সেণ্ট টমাস চার্চের পথে একদল তীর্থযাত্রী একে একে যে কাহিনী শুনিয়েছে তা তৎকালীন ইংলণ্ডের সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের

দৈনন্দিন বাস্তব জীবনেরই সুখ-দুঃখের কাহিনী। তাতে কল্পনার বর্ণালী অনুরঞ্জন নেই এতটুকু। এখানে নাইট বলেছে তার বীরত্বের কথা, জমিদার বলেছে তার প্রেমের কথা, বাথের স্ত্রী বলেছে তার পাঁচ পাঁচটি স্বামীর ব্যবহারের কথা ও বিবাহ সম্পর্কে তার স্বাধীন মন্তব্য—এমনি করে এক একজন মানুষের জীবনের কথা এক একটি কাহিনী হয়ে উঠেছে। সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের কয়েকটি সাধারণ মানুষ জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতালব্ধ যে জ্ঞান লাভ করেছে সেই জ্ঞানের কথাই চসার যথাসম্ভব আত্মনিরপেক্ষ হয়ে বিশেষ সংযমের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন।

দুই

'ডিভাইন কমেডি'তে দান্তে ধর্মকে যত সূক্ষ্ম ও পরোক্ষভাবেই প্রয়োগ করুন না কেন, অন্যত্র যখন তিনি ঈশ্বরকে সম্বোধন করে বলেন, la sua voluntade e´ nostra pace, অর্থাৎ তোমারই ইচ্ছার উপর আমাদের সকল শান্তি নির্ভর করছে, তখন তাঁর উৎকট ধর্মাসক্তি ও অকুণ্ঠ ধর্মনির্ভরতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। একদিকে মানবাত্মার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে অকপট স্বীকৃতিদান ও অন্যদিকে ঐশ্বরিক ইচ্ছার স্থিতি-স্থাপকতার উপর জীবনের ভালোমন্দ সবকিছুর জন্য অকুণ্ঠ নির্ভরতা দান্তের কাব্যপ্রত্যয়ের মধ্যে এক জটিল বৈপরীত্যের উদ্ভব করেছে। এদিক থেকে ভার্জিলের কবিদৃষ্টি কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ এক মানবিক মূল্যবোধের দ্বারা সমৃদ্ধ। তাই তিনি অকুণ্ঠভাবে বলতে পেরেছেন :

> "Felix qui potuit rerum cognoscere causas
> Quique metus, et inexorable fatum."

সেই মানুষই প্রকৃতপক্ষে সুখী যে কার্যকারণ নিয়মকে জানতে পেরেছে এবং নির্মম নিয়তি ও সকল রকমের ভয়কে পদানত করতে পেরেছে। মানুষের এই নির্ভীক ও দুর্বার আত্মশক্তির প্রতি অকপট বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ছি বলেই ভার্জিলের কাব্যপ্রত্যয় সমস্ত সংশয় ও বৈপরীত্য থেকে মুক্ত হতে পেরেছে এতখানি।

মানবজীবনের উত্থানপতনে মানবাত্মার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও প্রতিবে প্রভাব উভয়েরই সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, একথায় শেক্‌সপীয়ার দৃ

বিশ্বাসী হয়েও মাঝে মাঝে শিশুসুলভ এক সকরুণ অসহায়তায় ঈশ্বরের কোলে ঢলে পড়েছেন। 'কিং লীয়ার'-এ তিনি বলেছেন :

> "As flies to wanton boys, are we to to the gods ;
> They kill us for their sport."

আবার অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত যুবরাজ হ্যামলেট কাতরভাবে বলে উঠেছে :

> "O God O God !
> How stale, flat, unprofitable seems to me
> All the uses of the world."

পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত ইওরোপীয় চিন্তার ক্ষেত্রে ধর্মগত সংস্কার ও বিশ্বাসের যে একাধিপত্য চলে তা একমাত্র বিজ্ঞানের আবির্ভাব ও তার ক্রমোন্নতির দ্বারাই কিছুটা প্রশমিত হয়। রেনেসান্স বা নবজাগরণের ফলে মানুষের মনের অন্ধকার দিগন্তে যে স্বাধীন চিন্তার অভ্যুদয় হয়, তার স্বচ্ছ আলো মানুষকে কিছুটা সত্যসন্ধিৎসু করে তুললেও তার মনের উপর থেকে এই ধর্মগত একাধিপত্যকে প্রশমিত করতে পারে নি বিন্দুমাত্র। পরে মার্টিন লুথারের ধর্মসংস্কার আন্দোলন প্রচলিত ধর্মচেতনার বলিষ্ঠ দেহ থেকে ক্যাথলিক কুসংস্কারের কালো খোলসটাকে ছাড়িয়ে নূতন একটা পোশাক পরিয়ে দেয় মাত্র। প্রভূত সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এই ধর্মসংস্কার চিন্তার ক্ষেত্রে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত করতে সক্ষম হয় নি। একমাত্র ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্ব ও টমাস হাক্সলের কার্যকারণ নিয়ম সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বহু চিন্তাশীল মানুষের মনকে প্রবলভাবে নাড়া দেয় এবং তখন থেকে অনেকে ক্রমশ ঈশ্বরের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলতে থাকেন। তাছাড়া বিজ্ঞানের বলিষ্ঠ ও দর্পিত পদক্ষেপে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোসহ অন্যান্য বাস্তব অবস্থাগুলি একে একে ধ্বসে যাওয়ার পর নূতন যন্ত্রশিল্পের মাধ্যমে নূতন যে সব বাস্তব অবস্থা গড়ে ওঠে, তার ফলে মানুষের প্রচলিত জীবনভঙ্গিমার আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তিত জীবন-ভঙ্গিমা এক তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে তার ভাবজগতে। প্রাচীনকালে মানুষ জগৎ ও জীবনের যে সব বস্তু বা ঘটনাকে এক অসহায় মানসিক নিষ্ক্রিয়তার মধ্য দিয়ে সহজভাবে গ্রহণ করত, এখন সেগুলিকে বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখতে লাগল। এই নূতন যুগসন্ধিক্ষণে বিভিন্ন প্রতিকূল শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও ধর্ম ও ঈশ্বরের উপর যাঁদের আস্থা অবিচল ও

অক্ষুণ্ণ রয়ে গেল তাঁরাও যুক্তিসিদ্ধ এক চেতনার স্বচ্ছ আলো দিয়ে ধর্মের স্বরূপটিকে বিচার করতে শুরু করলেন।

তাঁরা বুঝতে পারলেন, ধর্ম মানেই আগেকার সেই অন্ধ সংস্কারপ্রবণতা ও কতকগুলি অতিপ্রাকৃত উপদেবতায় বিশ্বাস নয়; ধর্মচেতনা আসলে হচ্ছে মানুষের নীতিচেতনারই পরিণত রূপ। মানুষের মনে ন্যায় অন্যায় ভালো মন্দ প্রভৃতি বিষয়ে যে সহজ ও সাধারণ নীতিবোধ আছে, ধর্মের ঈশ্বর হচ্ছেন সেই চূড়ান্ত নীতির প্রতীক। দার্শনিক কান্ট বললেন, ধর্ম হচ্ছে নীতি। ফিক্‌টে বললেন, ধর্ম হচ্ছে জ্ঞান; এই জ্ঞান মানুষের মধ্যে এমন এক বিশুদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি সঞ্চারিত করে, যার সাহায্যে মানুষ জীবনের অনেক মৌল সমস্যার সমাধান ও বিশ্বজীবনের সঙ্গে এক আত্মিক সঙ্গতি খুঁজে পায় এবং যা একান্ত-ভাবে তার চিত্তশুদ্ধি ঘটায়:

"The essence of religion is the strong and earnest direction of the emotions and desires towards an ideal object recognised as of the highest excellence and is rightfully paramount over all selfish object of desire."

স্বার্থান্ধ আবেগানুভূতিগুলিকে এক আদর্শ ও মহত্তম লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করাই হল ধর্মের প্রকৃত কাজ। ধর্ম সম্বন্ধে এই দার্শনিক প্রত্যয় কিন্তু কোনো কাব্য বা সাহিত্যে সার্থকভাবে প্রযুক্ত হতে দেখা যায় নি। বরং যে সব ধর্মপন্থীর দল ধর্মকে নীতির প্রতীক হিসেবে না দেখে সমগ্র বিশ্ব চরাচরে ব্যাপ্ত এক অনন্ত অদ্বৈত সত্যের প্রতি আত্মিক প্রবণতারূপে গণ্য করেন তাঁদের মত বিশেষভাবে প্রভাবিত করে অনেক কবিকে। এই সব কবিদের মধ্যে ওয়ার্ডসোয়ার্থ, ইয়েটস, রবীন্দ্রনাথ ও জর্মান কবি শিলার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ওয়ার্ডসোয়ার্থ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই ছিলেন সর্বেশ্বর-বাদী। ওয়ার্ডসোয়ার্থের বিশ্বাস ছিল, এক সর্বব্যাপী ঐশ্বরিক সত্তা প্রকৃতি-জগৎ ও মানুষের মনোজগতের সমস্ত বস্তু ও ঘটনার অন্তস্থলে ঘূর্ণীভূত কারণ-রূপে নিহিত থেকে সকল কিছুকে নিয়ন্ত্রিত করছে, যার:

"...Dwelling is in the light of the setting sun
And the round ocean and the living air,
And the blue sky and in the mind of man:
A motion and a spirit that impels

All thinking things, all objects of all thought
And rolls through all things."

জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে ও মানুষের অন্তরে বিরাজিত এই ঐশ্বরিক সত্তাকে রবীন্দ্রনাথ বলতেন ব্রহ্ম যিনি মানব মনের চেতনায় এক পরম আনন্দানুভূতি-রূপে প্রতিফলিত এবং যিনি "অনোরণীয়ান মহতো মহীয়ান" প্রতিটি বস্তুর অন্তরে তার চূড়ান্ত সত্যরূপে সমাহিত। যিনি বিশ্বসাথে যোগে বিহার করেন এবং যাঁকে স্পর্শ করা না গেলেও সকল দেহেই তিনি সহজভাবে ধরা দিয়েছেন। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে এই ধর্মগত প্রত্যয়ের প্রাণনালী থেকে রস সংগ্রহ করেই ওয়ার্ডসোয়ার্থ ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রত্যয় প্রধানত পরিপুষ্ট লাভ করেছে। জগৎ ও জীবনের সঙ্গে তাঁদের যে আত্মীয়তাবোধ তাঁদের অনেক কবিতাকে মহত্ত্বের গৌরব দান করেছে, সে আত্মীয়তাবোধ মূলত এই ধর্মচেতনার উপরই নির্ভরশীল, তা কখনোই স্বতোৎসারিত বা বিশুদ্ধ আবেগানুভূতি সঞ্জাত নয়। অনেক সময় তাঁদের ধর্মচেতনা ও জীবনচেতনা ওতপ্রোতভাবে সংমিশ্রিত হয়ে এক নীরস জ্ঞানগত কৃত্রিমতায় ঘনীভূত ও প্রকট মূর্তি ধারণ করে মূল কাব্যরসের সঙ্গে সম্মুখ বিরোধে অবতীর্ণ হয়েছে।

ক্যাজামিয়াঁর মতে কেন্দ্রীয় ধর্মাবলম্বী ইয়েট্‌সের অতীন্দ্রিয় ধর্মপন্থিতা ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও সর্বেশ্বরবাদের দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডসোয়ার্থের মতো তাঁর এই সর্বেশ্বরবাদ তাঁর কাব্যে কোথাও উগ্রতায় প্রকটিত হয়ে উঠতে পায়নি; বরং তা তাঁর অতীন্দ্রিয় ভাববস্তুর কাছে গোপনে আত্মসমর্পণ করে এক স্বপ্নমেদুর কুয়াশায় সমাচ্ছন্ন, অজস্র প্রতীকী বস্তুর প্রান্তরালে সহজ সৌন্দর্যে অবগুণ্ঠিত। শিলার তাঁর কবিতায় ঈশ্বরের শক্তিমত্তা সম্পর্কে অনেক কথা বললেও ঈশ্বরের সর্বব্যাপকতা সম্পর্কে একেবারে নীরব। তাঁর মতে যে ঈশ্বর মানুষের জন্মের পূর্বেও মানুষকে ভালোবাসতেন তিনি স্বর্গ থেকে এক ঐশ্বরিক শৃংখলারূপে নেমে এসে মানুষের বিক্ষিপ্ত ও বিক্ষুব্ধ শক্তিসমূহকে সংহত ও শৃংখলাবদ্ধ করে সৃষ্টির পথে চালনা করেন।

ব্রাউনিংয়ের ঈশ্বর সম্পর্কিত মতবাদ কিন্তু এদের সকলের থেকে পৃথক। তিনি বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বর মানব-জগৎ ও প্রকৃতি-জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। মানুষ শক্তি, জ্ঞান ও প্রেম—এই তিনটি গুণের দ্বারাই ঈশ্বরের সহিত একাত্মতা লাভ করতে পারে। এদের মধ্যে প্রেমই সর্বোৎকৃষ্ট গুণ, কারণ এই প্রেমই

মানুষের শক্তি ও জ্ঞানকে উন্নত করে। যে ঈশ্বরের ইচ্ছাচক্রে মানুষের ভাগ্য গঠিত তাঁর মঙ্গলময় আশীর্বাদকে বিশ্বের ভালো মন্দ সব কিছুর মধ্যে নিহিত দেখেছেন ব্রাউনিং।

"All I could never be
All men ignored in me
This, I was worth to God, whose wheel the pitcher shaped."

ব্রাউনিংয়ের সকল শ্রেষ্ঠ কবিতার ভাবকল্পনা ও আদর্শ প্রেম সম্পর্কে সকল চেতনা এই উগ্র ঈশ্বরানুভূতি থেকে যে উৎসারিত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ কারো থাকতে পারে না।

তিন

যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে একেবারে বিশ্বাস করেন না, দার্শনিক প্রত্যয়ের দিক থেকে তাঁদের সাধারণত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে—একজন বস্তুবাদী ও অপরজন নাস্তিকতাধর্মী অস্তিত্ববাদী। বস্তুবাদীদের মূল কথা হল, বস্তু-জগতের ভিতরে বা বাইরে আর কোনো সত্য নেই। আমরা যাকে চেতনা বা আত্মা বলে থাকি তা যে সকল উপাদান নিয়ে কোনো বস্তু গঠিত, বস্তুর সেই সব উপাদানগত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থেকে উদ্ভূত এক শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের এদেশে চার্বাক দর্শনে এই জড়বাদী বস্তুধর্মিতার কথা সুন্দর-ভাবে উল্লিখিত আছে :

"চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে···" অর্থাৎ জল, মাটি, অগ্নি, বায়ু পৃথিবীর এই চারটি মৌলিক পদার্থ থেকেই চৈতন্যের সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্তো অষ্টাদশ শতকে যদিও ফরাসী বস্তুবাদীরা প্রতিক্রিয়াশীল ধর্ম ও ফিউডাল পদ্ধতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন তথাপি আমার মনে হয় ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এক-মাত্র কার্ল মার্কসই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ধর্মের সমস্ত অসারতা প্রমাণ করে তার প্রকৃত স্বরূপটিকে উদ্ঘাটিত করেন। মার্কসের মতে—

"Religion is nothing but the fantastic reflection in man's mind of those external forces which control their daily life, a reflection in which the terrestrial forces assume the form of supernatural forces."

ধর্ম হচ্ছে মানুষের মনে এমন এক অদ্ভুত মানসিক ক্রিয়া যার মধ্যে সে

সকল পারিপার্শ্বিক পার্থিব শক্তি তার দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে, সেইসব শক্তিগুলি এক একটি অতিপ্রাকৃত শক্তিরূপে প্রতিফলিত হয়। মার্কস বললেন, আদিমকালে মানুষ প্রতিকূল প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে যে অসহায়তা অনুভব করত, সেই অসহায়তাবোধ থেকেই ধর্মবিশ্বাসের প্রথম উদ্ভব হয়। আবার আজকের দিনে সমাজে ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে শোষিত শ্রমিকশ্রেণী অনুরূপ এক দুর্বলতা ও অসহায়তা অনুভব করছে এবং এই দুর্বলতা ও অসহায়তাবোধের পূর্ণ সুযোগ নিয়েই সেই পুরনো ধর্মবিশ্বাস এক দুষ্ট কীটের মতো তাদের মনের মধ্যে গোপনে পুষ্টিলাভ করে তাদের সমস্ত শক্তি ও সাহসকে কুরে কুরে খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলছে। এই ধর্মবিশ্বাস তাদের শেখাচ্ছে, যে সুযোগ ও সম্পদের অধিকার থেকে এ জীবনে তারা অন্যায়ভাবে বঞ্চিত, যা তারা লাভ করতে পারছে না তাদের শক্তি দিয়ে তা তারা মৃত্যুর পর সব পাবে ঈশ্বরের অবিসংবাদিত মধ্যস্থতায়। এই-ভাবে ধর্ম তাদের এক ভ্রান্ত ও মোহপ্রসারী আশার মোহিনী মায়ার মধ্যে ঢেলে দিয়ে তাদের সংগ্রামী শক্তিকে বিনষ্ট করে দিচ্ছে। তাই তিনি বললেন, "Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart, of the heartless world. It is the opium of the people." ধর্ম হচ্ছে উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত মানুষের দীর্ঘশ্বাস, ধর্ম হচ্ছে নিষ্ঠুর হৃদয়হীনের মর্মবাণী, ধর্ম হচ্ছে সেই আত্মঘাতী অহিফেন যা সেবন করে মানুষ তার সমস্ত কর্মশক্তিকে নিজের হাতে ঘুম পাড়িয়ে রাখে।

নাস্তিকতাধর্মী বা জড়বাদী অস্তিত্ববাদের মুখপাত্ররূপে জাঁ পল সার্তর তাঁর 'd' Existentialisme est un humanisme' গ্রন্থে ঘোষণা করলেন, ঈশ্বর বলে কোনো কিছু নেই। কোনো পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে ঈশ্বর কখনো মানুষ সৃষ্টি করেন না বা মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন না। মানুষের জন্মের আগে বা মৃত্যুর পরে অথবা তার জীবনের অলক্ষ্য উর্ধ্বে কোনো ঐশ্বরিক সত্তা উপস্থিত থেকে তার সমগ্র অস্তিত্বকে চূড়ান্তভাবে পরিবৃত করে নি। মানুষ তার অস্তিত্বের জন্য সম্পূর্ণরূপে সে নিজে দায়ী এবং মানুষ যে আছে, তার এই অস্তিত্বই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা; এই অস্তিত্বের অন্তস্থলে কোনো স্বরূপ বা সত্তা আছে কিনা সেটা বড় কথা নয়, কারণ "existence is prior to essence."

ঈশ্বর নেই বলেই এমন কোনো নৈতিক অজুহাত নেই যার দ্বারা মানুষ

তার কর্মাকর্মকে ব্যাখ্যা করতে পারে। আসলে মানুষ তার সারাজীবনের সমস্ত কর্মের জন্য সে নিজে দায়ী। সার্ত্র বলেন :

"The first effect of existentialism is that it puts everyman in possession of himself as he is, and places the entire responsibility for his existence squarely upon his shoulders…Thus we have neither behind us, nor before us, in a luminous realm of values, any means of justification or excuse."

উজ্জল মূল্যের এক স্বর্ণজগতে এমন কোনো চূড়ান্ত সত্তা অধিষ্ঠিত নেই যাকে উদ্দেশ্য করে আমরা মহাভারতের দুর্যোধনের মতো জীবনের শেষ প্রান্তে গিয়ে নিশ্চিন্তে বলতে পারব :

"জানামি ধর্মং ন চ প্রবৃত্তিঃ জানাম্যধর্মং ন চ নিবৃত্তিঃ
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।"

ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আমাদের অস্তিত্ব বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত অবস্থার যে মহাসত্যে উপনীত হয়, সে সত্য আমাদেরি ঐচ্ছিক কর্মের একান্ত প্রতিফল ছাড়া আর কিছু নয়। অবাধ অপ্রতিরুদ্ধ স্বাধীনতাকে ভিত্তি করে চারিদিকের শূন্যতাকে ভেদ করে দিনে দিনে উত্তুঙ্গ হয়ে উঠছে আমাদের যে অস্তিত্ব এক মহাশিল্পীর মতো আমরাই তাকে তিলে তিলে গড়ে তুলি, আমাদেরি কামনার কারুকার্য দিয়ে তাকে আমরা অলঙ্কৃত করি, আশা ও উদ্দেশ্যের রসে তাকে সঞ্জীবিত করি, শক্তি ও সাধনা দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করি। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে জর্মান কবি মেরিয়া রিল্‌কে তাঁর 'Die Sonette an Orpheus' কবিতায় মানুষের এই অবাধ উন্মুক্ত অস্তিত্বের জয়গান গেয়ে মানবজীবনে যন্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রাধান্যকে নিন্দিত করেছেন, কারণ তা মানুষের সৌন্দর্য সৃষ্টির কাজ ব্যাহত করে :

"It is life, it thinks it knows best as it orders, produces and destroys with equal resolve."

কিন্তু অস্তিত্ববাদীরা ঈশ্বরকে অস্বীকার করলেও মানুষের অস্তিত্বকে চারি-দিকের পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে অবাধ স্বাধীনতার শূন্যে সংস্থাপিত করার ফলে যে নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তাঁদের অজানিতে, সেই সমস্যার দ্বারা তাঁদের অস্তিত্বের মর্যাদা ক্ষুণ্ন না হয়ে পারেনি। জাঁ পল সার্ত্রের 'দি এজ্‌ অফ্‌ রিজন' উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র ব্রুনেট নায়ক ম্যাথিউর

কাছে অস্তিত্ববাদের এই অপূর্ণতার কথাটিকে ব্যক্ত করেছে স্পষ্ট ভাষায়: "you live in a void, you have cut your bourgeois connections, you have no tie with the proletariat, you're adrift, you're an abstraction, a man who is not there…you renounced everything in order to be free. Take one step further, renounce your freedom : and everything shall rendered unto you". ম্যাথিউ নিজেও পরে স্বীকার করেছে তার উদ্দেশ্যহীন এই নির্বিশেষ স্বাধীনতা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার কাছে। বস্তুত সমাজ ও সামাজিক পরিবেশের সুষ্ঠু সহযোগেই আমাদের অস্তিত্ব চূড়ান্তভাবে সার্থকতা লাভ করতে পারে।

সাহিত্যে ধর্মচেতনার সঙ্গে জীবনচেতনার যুগান্তকারী সংঘর্ষে প্রথম শহীদ হচ্ছে এসকাইলাসের 'প্রমিথিয়াস বাউণ্ড' নাটকের নায়ক বন্দী প্রমিথিয়াস। দেবরাজ জিয়াসের আদেশ অমান্য করে মানবজাতিকে জ্ঞানের আলো দান করে যে অপরিসীম শাস্তির বোঝা মাথা পেতে নিয়েছিল প্রমিথিয়াস, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নেই। দূর পৃথিবীর কোনো এক নির্জন দুর্গম প্রান্তে স্কাইথিয়া পাহাড়ের একটি বিশাল প্রস্তরস্তূপের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ঝড়, জল, বজ্রপাত প্রভৃতি সমস্ত বিপর্যয় নীরবে সহ্য করবে, তবু স্বর্গে গিয়ে জিয়াসের দাসত্ব করবে না। জিয়াসের চর হারমিসকে তার শেষ কথা বলে দিল প্রমিথিয়াস : "In sooth all gods I hate…I shall never exchange my fetters for slavish serrility. 'Tis better to be chained to the rock than bound to the service of Zeus.

প্রমিথিয়াসের নির্ভীক উক্তির মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন এসকাইলাস ধর্ম-নিরপেক্ষ স্বাধীন মানবতার জয়গান গেয়েছেন অন্যদিকে তেমনি মানবতা নিরপেক্ষ দেব-মহিমার অসারতাকে সপ্রমানিত করেছেন। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে গ্যয়েটেও 'প্রমিথিয়াস' নামে একটি কবিতায় এক আশ্চর্য প্রত্যক্ষ-ভাষিতার সঙ্গে বলেছেন, যে ঈশ্বর আশাহত মানুষের অবান্তর কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট এবং নির্বোধ শিশু ও ভিখারীদের অহেতুক বিশ্বাসের রসে সঞ্জীবিত, তিনি জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে কখনই সে ঈশ্বরের শরণাগত হবেন না।

"I sit here, make men in my image, a race which shall be like me to suffer, to weep, to enjoy and be glad and to ignore you as I did."

ঈশ্বরের কাছে না গিয়ে তিনি এই জগতে থেকেই তাঁর আদর্শ দিয়ে এমন সব মানুষ সৃষ্টি করবেন যারা তাঁর মতো হাসি কান্না ও সুখ দুঃখের মধ্য দিয়ে জীবনকে গভীরভাবে ভালোবাসবে এবং তাঁর মতোই ঈশ্বরকে অস্বীকার করবে।

চার

অনেকে মনে করতে পারেন, যে সব সাহিত্য ধর্ম বা ঈশ্বরকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে তারাও ধর্মের দ্বারা নঞর্থক (Negative) দিক থেকে প্রভাবিত। তাঁদের মতে সাহিত্যে ধর্মসম্বন্ধীয় কোনো কথাই থাকবে না। কিন্তু যাঁরা ধর্মের কোনো কথার একেবারে অবতারণা না করে সাহিত্য রচনা করেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় তাঁরা একদেশদর্শিতার দোষে দুষ্ট হয়েছেন। তাঁদের অনেকে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের বহিরঙ্গগুলিকে যথাযথ চিত্রিত করতে গিয়ে তাঁদের সমস্ত প্রতিভাকে এমনভাবে নিঃশেষিত করে ফেলেছেন যে অন্তর-জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলিকে সার্থকভাবে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হননি। আবার অনেকের প্রতিভা অতি তীক্ষ্ণ এক আত্মসচেতনতা ও অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা মানবমনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রতিটি আবেগানুভূতিকে বিশ্লেষণ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু স্তাঁদালের 'স্কারলেট এণ্ড দি ব্ল্যাক' ও এমিল জোলার 'জারমিনাল' ছাড়া এমন জীবনধর্মী ও বাস্তবানুগ সাহিত্য খুব কমই পাওয়া যায় যেখানে লেখক দুই দিক থেকেই কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন। বস্তু-জগৎ ও মনোজগৎ—এই দুই-এর সুষ্ঠু সামঞ্জস্যসাধনের উপরই মানব-জীবনের ভারসাম্য নির্ভর করে। সুতরাং যাঁরা বাস্তবানুগ জীবনধর্মিতাকে আজ সাহিত্যে অবিসম্বাদিত আদর্শ বলে মেনে নিতে সম্মত তাঁরা নিশ্চয়ই একথা অস্বীকার করবেন না যে, জীবনের বাহির ও ভিতর, বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ দুটিকেই সমান নিষ্ঠার সঙ্গে পরিস্ফুটিত করার যে সমান্তরালবর্তিতা, তাই হবে মহৎ সাহিত্যের সৌধ রচনার পক্ষে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বলিষ্ঠ ভিত্তি।

আর এক শ্রেণীর সাহিত্যিক আছেন যাঁরা ধর্মকে একেবারে উহ্য বা অনুপস্থিত না রেখে বা ধর্মকে অস্বীকার করবার কোনো চেষ্টা না করে সমাজ ও জীবনকে চিত্রিত করতে গিয়ে সমসাময়িক জীবনের খাতিরেই বাধ্য হয়ে ধর্মকে তাঁদের সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। যে সব জীবন ও সমাজের কথা সাহিত্য বলতে চায় সেই সব জীবন ও সমাজের সঙ্গে ধর্ম যদি অবিচ্ছেদ্যভাবে

জড়িয়ে থাকে তাহলে সাহিত্যে ধর্মের এই অবাঞ্ছিত অথচ বৈধ অভ্যাগমকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারেন না। ফ্লবেয়ারের 'মাদাম বোভারী'র মধ্যে দেখা যায়, পর পর দুবার চার্চ থেকে বিশপ ডেকে ধর্মীয় আচার আচরণের দ্বারা মৃতপ্রায় এম্মা বোভারীকে সারিয়ে তোলার চেষ্টার মধ্যে তৎকালীন একটি কুসংস্কারপ্রসূত সামাজিক রীতিই প্রতিফলিত হয়েছে এবং শেষের দিকে মুমূর্ষু এম্মার পাশে বিশপ ও কেমিষ্ট হোমার মধ্যে ধর্মগত বিশ্বাস ও অবিশ্বাস নিয়ে বিতর্কটিকে লেখক বিশেষ আত্মনিরপেক্ষভাবেই উপস্থাপিত করেছেন। ম্যাক্সিম গোর্কির 'মাদার' উপন্যাসে বিপ্লব মন্ত্রের মূর্ত প্রতীক পাভলভের মা শোষিত ও ক্ষুধিত জনগণকে মুক্তির বাণীর সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের বাণী ও খ্রীষ্টের বাণী (God's truth, Christ's truth) শুনিয়েছেন। এখানেও লেখক আত্মনিরপেক্ষভাবে এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে, তখনকার দিনে ঐ সব মানুষের মধ্যে জীবনসত্যের সঙ্গে ধর্মের সত্যকে একাত্ম করে দেখবার একটা বিশেষ প্রবণতা ছিল। 'রেজারেকশান্' উপন্যাসে টলস্টয় কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তাঁর আত্মগত খ্রীষ্টীয় ধর্মচেতনার পরিচয় দিয়েছেন। পাপের অন্ধকার ও দুঃসহ শাস্তির বোঝা ঠেলে শুচিশুভ্র চৈতন্যের নির্মল আলোকের মধ্যে কিভাবে মানবাত্মা নবজন্ম লাভ করে, তা পরিব্যক্ত করবার জন্য 'রেজারেকশান্' নামকরণটিকে বেছে নিয়েছেন লেখক। এখানে একটি নৈতিক ভাববস্তু ধর্মীয় নামকরণের মধ্যে অতি সহজেই দ্যোতিত হতে পেরেছে। শেষের দিকে নিউ টেষ্টামেণ্টের কতকগুলি নীতি-উপদেশ সংযোজিত করে কাহিনীকে যেভাবে অহেতুক ঋষিসুলভ ধর্মচেতনার দ্বারা কণ্টকিত ও খ্রীষ্টীয় ক্ষমাগুণ প্রচারের দ্বারা উৎপীড়িত করেছেন তাতে উপন্যাসের সাবলীল রসস্রোত ব্যাহত না হয়ে পারেনি ; তাতে 'রেজারেকশান্' মহৎ উপন্যাসের গৌরব থেকে বঞ্চিত না হয়ে পারেনি। সহসা ধর্মচেতনার দ্বারা তাঁর জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে আমূল পরিবর্তিত হয়েছে তা নিজের ভাষায় বলে গেছেন টলষ্টয় :

"Five years ago faith came to me ; I believed in the doctrine of Jesus, all my life suddenly changed. I ceased to desire that which previously I desired, and on the other hand I took to desiring what I had never desired before. That which formerly used to appear good in my eyes appeard evil, that which used to appear evil appeared good."

পরিবর্তনশীল সমাজের পটভূমিকায় প্রচলিত ধর্মচেতনার সঙ্গে নবলব্ধ জীবনচেতনার সংঘর্ষের ফলে যে সংশয়ের ও যুগযন্ত্রণার সৃষ্টি হয় ডস্টভয়স্কি তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে তাকে রূপায়িত করলেও বহুক্ষেত্রে তিনি জীবন ছেড়ে ধর্মের প্রতি বেশি আসক্ত হয়ে পড়েছেন। 'দি কারামাজোভ ব্রাদারস'-এ আইভান কারামাজোভের মতো তাঁর কোনো কোনো নাস্তিক চরিত্র ধর্মের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালেও দ্মিত্রি কারামাজোভের মতো যারা ধর্মবিশ্বাসী; এবং অপরাধী ও স্বভাবত পাপাত্মা হলেও যাদের অপরাধপ্রবলতা খ্রীষ্টীয় পাপ-চৈতন্যের দ্বারা পরিশুদ্ধ, সেই সব চরিত্রের উপর তিনি তাঁর সমস্ত সহানুভূতি নিঃশেষে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন :

"Unless you sin, you will not repent : unless you repent you shall not be saved."

খ্রীষ্টের অনুকরণে দ্মিত্রির এই নীতি-উপদেশ লেখকেরই উপদেশ। কিন্তু অসংখ্য অন্যায় করেও সকল মানুষ কেন অনুতাপের আগুনে পুড়ে শুদ্ধ হয়ে সাধু হয় না, ঈশ্বর মঙ্গলময় হওয়া সত্ত্বেও কেন মানুষ মানুষের হাতে শোষিত লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হচ্ছে প্রতিদিন, অথবা ক্ষমার দ্বারা সমস্ত অন্যায়ের যথার্থ প্রতিকার হয় কিনা—এইসব মৌল প্রশ্নগুলির জবাব দিয়ে যেতে পারেননি ডস্টভয়স্কি। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : "I am till now a child of the times, a child of disbelief and doubt, and I know I shall remain such till the grave."

কিন্তু যদিও নিজেকে সংশয় ও অবিশ্বাসে ক্ষতবিক্ষত যুগমানসের সৃষ্টি বলে ঘোষণা করেছিলেন, তথাপি তাঁর সাহিত্য এই সাক্ষ্য দান করে যে, তিনি সমস্ত সংশয়ের কুয়াশা সরিয়ে ধর্মের মধ্যেই তাঁর আকাংক্ষিত সত্যকে খুঁজে পেয়েছিলেন। বাস্তববাদী প্রসিদ্ধ রুশশিল্পী রেপিণ ডস্টভয়স্কি সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন, "Dostoyevsky is a great talent in art, a profound thinker and a warm heart, but he is a broken and down-cast man, one who is afraid to tackle the vital problems of human life and looks backwards the whole time."

তাঁর শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার জন্যই মানুষের অমিত প্রাণশক্তির প্রবল বেগটিকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে না পেরে ধর্মের মোহ মেদুর আশ্রয়ে অসহায়ভাবে ঢলে পড়েছিলেন ডস্টভয়স্কি। তিনি কখনই একথা বিশ্বাস করে যেতে পারেননি, মানুষই একদিন এইসব অত্যাচার অবিচারের

অবসান ঘটিয়ে স্বর্ণযুগ নিয়ে আসবে পৃথিবীতে। তিনি শুধু বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর মঙ্গলময়। "Thou art just Lord, for thy ways are revealed." অ্যালোশা কারামাজোভের মুখে বাইবেলের এই কথাটি প্রতিধ্বনিত করে তাঁর মনের গভীরতম বিশ্বাসের কথাটিকেই বলে গেছেন ডস্টভয়স্কি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথেরও সমস্ত কাব্যসৃষ্টির মূলে অনুরূপ এক ধর্মচেতনার অন্তঃসলিলা অবাধে বয়ে চলেছিল। তিনিও অন্তরে বাইরে ঈশ্বরের মঙ্গলময় রূপটিকেই প্রত্যক্ষ করতেন সব সময়।

"যত্তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি
যোসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি ॥"

তোমার কল্যাণতম যে রূপ, আমার কাছে আজ তা দীপ্যমান প্রত্যক্ষ। যে পুরুষ সমগ্র বিশ্ব চরাচরে বিরাজিত, আমার মধ্যেও সেই পুরুষ অভিন্নভাবে বিদ্যমান। ঈশোপনিষদের এই বাণীতে গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন রবীন্দ্রনাথ যার অধিকাংশ কাব্যপ্রেরণার একমাত্র উৎসস্থল ছিল সর্বব্যাপী এক অখণ্ড ঐশ্বরিকসত্তা এবং যাঁর একমাত্র মনের কথা হল, "শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক"। কিন্তু তাঁর কবিজীবনের শেষ পর্যায়ে কতকগুলি ঘটনার রূঢ় আঘাতে তাঁর ধর্ম-নির্ভর কাব্যপ্রত্যয় দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায় সহসা। তখন তিনি বুঝতে পারেন, জীবনে শুধু শান্তিই সত্য নয়, শুধু অবিমিশ্র ভালো দিয়েই এ জগৎ গঠিত নয়; ভালো, মন্দ, ললিত-কঠোর, বিরোধ-বিষমতা সব কিছুর দ্বৈত অস্তিত্বের অসম সংমিশ্রণেই এই জগৎ ও জীবন গঠিত। তখন ঈশ্বরের ক্ষমাগুণ সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে মনে, মানবতার ভয়াবহ সংকটে বিমূঢ় হয়ে পড়েন। এইসব অন্তর্দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর উগ্র ধর্মচেতনাকে পরিহার করে চলতে পারেননি কখনো রবীন্দ্রনাথ, তাঁর ব্রহ্মবাদের উপর অবিচল আস্থার বিরতি ঘটেনি কখনো এতটুকু। তথাপি তার 'রূপনারানের কূলে' নামক ছোট কবিতাটি তাঁর আত্মিক সত্যোপলব্ধির এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে।

"রূপনারানের কূলে জেগে উঠিলাম
জানিলাম এ জাবন স্বপ্ন নয়
রক্তের অক্ষরে জানিলাম আপনার রূপ
চিনিলাম তারে আঘাতে আঘাতে বেদনায় বেদনায়
সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালবাসিলাম।"

উনিশ শতকের শেষার্ধে ফরাসী কবি র‍্যাঁবোও সাম্রাজ্য, শোষণ, রক্তপাত

ও অত্যাচার সমন্বিত মানবসভ্যতার ঘনীভূত সংকটে ক্ষুব্ধ হয়ে সব কিছুর ধ্বংস প্রার্থনা করেন এবং মানুষের জীবন সমস্যার সমাধানে ধর্মের শোচনীয় অক্ষমতা ও ব্যর্থতার কথা বুঝতে পেরে নিতান্ত সঙ্গতভাবেই ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। তাঁর 'Les Premieres Communious' কবিতার প্রথমেই তিনি বলেছেন, "Really it is idiotic, these village churches where fifteen ugly brats, dirtying pillars and pronouncing divine prattle with thick burt, listen to a black grotesque with sweaty shoes."

কোনো সাহিত্যে লেখকের আত্মসাক্ষিক ধর্মপ্রীতি বা ধর্মনির্ভরতা কখনোই বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ যে সাহিত্যে কোনো অদৃশ্য ঈশ্বর বা অতিপ্রাকৃত সত্তাকে মানব জীবনের নিয়ন্ত্রক ও প্রযোজক কর্তারূপে উপস্থাপিত করা হয়, প্রাকৃত বস্তু বা ঘটনাকে প্রাকৃত কারণ দ্বারা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয় না, সে সাহিত্যের পরিণতি পাঠকের মনে বিষাদাত্মক বা হর্ষাত্মক কোনো বিশুদ্ধ রস বা আবেগানুভূতির সঞ্চার করতে পারে না। মানুষ যখন জীবনের প্রতিটি ঘটনা ও কার্যকে ঈশ্বরের অপ্রতিরোধ্য ও অপরিহার্য বিধান বলে মেনে নে তখন স্বভাবতই যে জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির উপর কোনো ব্যক্তিগত প্রত্যাশা আরোপ করে না। তখন মানুষ এক সহজ উদাসীনতায় ও ভক্তি স্রাবী ভাবালুতায় জীবনের সব কিছুকে গ্রহণ করে নেয়। তাই দেখা যায় ধর্মনির্ভর সাহিত্য মানুষের মনে একমাত্র যে রসের সৃষ্টি করতে পারে তা ভক্তিরস বা শান্ত রস। সাহিত্যে এই দুটি রসই নিকৃষ্ট, তাই এদের কোনো সম্মানযোগ্য স্থান নির্দিষ্ট নেই সেখানে। চারদিকের সামাজিক পরিবেশ ও বিভিন্ন ঘটনার সহিত জীবনের দৈনন্দিন সংঘাতের ফলে ভাবগত প্রতিক্রিয়ারূপে অস্তিত্বের গভীরতম প্রদেশে যে রসক্ষরণ হয় সেই রসই সাহিত্যের পক্ষে শ্রে রস। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে জীবন সম্পর্কে যে সত্য মানুষ উপলব্ধি করে অন্তরে, সেই সত্যই হচ্ছে সাহিত্যে সত্য। জীবন কখনো আঘাত সহ্য করে, কখনো সে আঘাত দেয়, কখনো সে সকাম, কখনো নিষ্কাম, কখনো সে অন্যায় করে, কখনো সে অন্যায়ে প্রতিকার করে—এমনি করে সুখ ও দুঃখ, বিরোধ ও বিষমতার বিচিত্র তা তুলে জীবনের যে দ্বান্দ্বিক অগ্রগতি, সকল যুগের সাহিত্যে সেই অগ্রগতিকে অনুভব করতে চায় মানুষ সমস্ত অন্তর দিয়ে। জীবন ও তার সমস্ত জৈবিক থেকে উৎসারিত যে সহজ চেতনাপ্রবাহ মানুষের প্রতিটি স্নায়ু ও শিরায় প্রবাহিত, সেই চেতনার কথা না বলে যখন কোনো সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যে প্রথমে কোনো ধর্মতত্ত্ব বা দর্শনতত্ত্বকে আশ্রয়বাক্যরূপে গ্রহণ করে ক্রমে থেকে জীবন সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রয়াস পান, তখন একই সঙ্গে জীবন ধর্ম ও শিল্প ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন।

পারমাণবিক বাস্তবতা

বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

১৯৫১ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখের আমেরিকান 'কলিয়ার্স' পত্রিকাখানা পাশে রয়েছে। এতে জে. বি. প্রিস্টলে-র একটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধটিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক যুদ্ধে সোভিয়েত দেশ জয় করেছে এবং সেখানে শিল্পকলার" মুক্তি" এসেছে।



প্রিস্টলে মত পরিবর্তন করেছেন। তিনি এখন শান্তি আন্দোলনে।

মস্কোয় মার্কিন অ্যাটমবোমা বর্ষণের 'ফোটো' শোভিত মার্কিন এম্-পি-র (মিলিটারি পুলিশ) বুটের তলায় "অবলুণ্ঠিত" সোভিয়েত দেশের মানচিত্রের প্রচ্ছদপটে সজ্জিত সেই যে 'কলিয়ার্স' পত্রিকায় "তৃতীয় মহাযুদ্ধের অগ্রিম দৃশ্য" তুলে ধরে ১৯৬০ সাল নাগাদ সেটাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার পরিকল্পনা উপস্থিত করা হয়েছিল, সে পত্রিকাখানা উঠে গেছে। কিন্তু

"১৯৬১ সালের কর্মসূচী সংক্রান্ত বিবৃতিতে" ইউ-এস এয়ারফোর্স অ্যাসো-
সিয়েশন "সোভিয়েত ব্যবস্থাটাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবার...জাতীয়
লক্ষ্য" ঘোষণা করেছেন, সেই পরিকল্পনা রয়েছে। সেই অ্যাসোসিয়েশনটি
মার্কিন বিমানবাহিনীরই বেসরকারী মুখপত্র, তা কারও অজানা নয়। সে-
মুখপত্রের সুবিদিত পৃষ্ঠপোষক হলেন আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের মারণাস্ত্র শিল্পের
শিরোমণিগণ। তাতে ঘোষিত "জাতীয় লক্ষ্য" অনুযায়ী সামরিক প্রস্তুতি
এবং মূল কৌশলগুলি নিরন্তর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের
সর্বোচ্চ রাষ্ট্রনায়কদের অসংখ্য উক্তিতে—সেই যে পরিকল্পনাটিকে "পৃথিবীর
উপর মৃত্যু পরোয়ানাস্বরূপ অতি ভয়ঙ্কর দলিল" বলে ধিক্কার দিয়েছেন,
বিভীষিকায় শিউরে উঠেছেন বৃটিশ দার্শনিক—আজ শান্তি-সৈনিক—বার্ট্রাণ্ড
রাসেল। সেই রাসেল ১৯৪৮ সালে "নিবর্তনমূলক" যুদ্ধের জন্যে, মস্কোয়
অ্যাটম-বোমা বর্ষণের আহ্বান জানাচ্ছিলেন। কেন?

১৯৫৯ সালে একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারপ্রসঙ্গে এই 'কেন'র জবাবে
বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন, "তখন পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র ছিল শুধু এক পক্ষে, তাই
সম্ভাবনা ছিল রুশেরা নতি স্বীকার করবে" (বারুচ পরিকল্পনায়—যাতে পশ্চিমী
সংখ্যাগরিষ্ঠতার দরুণ 'আন্তর্জাতিক' নিয়ন্ত্রণের নামে বোমার উপর এবং
পৃথিবীর সমস্ত পারমাণবিক কাঁচামালের উপর একচেটিয়া দখল থাকত
আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রেরই হাতে)।

প্রশ্ন: "ধরুন যদি তারা নতি স্বীকার না করত...তাহলে আপনি ঐ অস্ত্র
প্রয়োগ করতে বলতেন রুশদের উপর—ঐ অস্ত্রের বিভীষিকা সম্বন্ধে আপনি
আমার সঙ্গে কথায় যে শব্দগুলি ব্যবহার করলেন তা সত্ত্বেও?"

তার জবাবে রাসেল বলেন: "হ্যাঁ, তাই...তখন ভেবেছিলাম, এবং আশা
করেছিলাম রুশরা নতি স্বীকার করবে, কিন্তু হুমকি তো দেওয়া চলে না যদি
না সেটা কার্যে পরিণত করার জন্যে প্রস্তুত থাকা যায়।"

জে. বি. প্রিস্টলে তো নিশ্চয়ই নিজের ধারণা অনুযায়ী মানবিক শিল্প-
কলারই "মুক্তি" সাধনের জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর অ্যাটমবোমা-
বর্ষণের দাবি জানাচ্ছিলেন! আবার এখনও মানবিকতারই প্রেরণায় পার-
মাণবিক শান্তি চাওয়া হচ্ছিল। এই "দুই মানবিকতা"র মধ্যে একটা প্রভেদও
নিশ্চয়ই রয়েছে। ইতিমধ্যে এ প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ
যা ঘটেছে তা হল সোভিয়েত ইউনিয়ন নতি স্বীকার করেনি। বার্ট্রাণ্ড রাসেল

মত বদলেছেন। ১৯৪৮ সালে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে "নিবর্তন-
মূলক" পারমাণবিক যুদ্ধের পরিকল্পনাটাকে দানবীয় কিংবা "পৃথিবীর উপর
মৃত্যুপরোয়ানাস্বরূপ" মনে করছিলেন না, কারণ, তখন তাঁর "আশা ছিল"
অপর পক্ষের আত্মরক্ষা করবার, আত্মরক্ষার্থে পাল্টা আঘাত হানবার ক্ষমতা
ছিল না।

পারমাণবিক কর্মনীতি কোন্‌টা কখন কেন মানবিক কিংবা দানবীয় গণ্য
হচ্ছে?

আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান রাষ্ট্রপতির 'বিজ্ঞান উপদেষ্টা কমিটি'র
সভাপতি জেরোম্. বি. ভাইস্‌নার-এর মতো ব্যক্তির হিসাবও দেখা যেতে পারে।
তাঁর মূল ন্যায়-নীতিজ্ঞান, চিন্তা-ভাবনার গতিবিধি কোন্ নিরিখে চলে, তা বলা
বাহুল্য: ("দেশের শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যবস্থার জন্যে যারা অনেকে গত পনর
বছর যাবত কঠোরভাবে কাজ করেছেন তাঁদের থেকে খুব একটা পৃথক নয়
আমার অভিজ্ঞতা")। সেই ভাইস্‌নার বলেছেন: "আমাদের প্রত্যেকটি
অগ্রগতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সোভিয়েতকে অগ্রসর হতে দেখেছি, ফলে, কাল-
গতিতে একমাত্র লক্ষণীয় ফল হয়েছে এই যে, আমাদের উভয় জাতিই ক্রমে
অধিকতর ধ্বংসশক্তিসম্পন্ন এমন সব অস্ত্রশস্ত্র সৃষ্টি করেছে যার বিরুদ্ধে কোনো
আত্মরক্ষাব্যবস্থা হয় না" ('আর্মস কন্ট্রোল অ্যাণ্ড ডিসআর্মামেণ্ট':
আমেরিকান ভিউজ অ্যাণ্ড স্টাডিজ। ডি. জি. ব্রেনান সম্পাদিত। জোনাথান
কেপ)।

ভাইস্‌নারই বলেছেন: "যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান
উপলব্ধি দেখা যাচ্ছে যে, ত্বরান্বিত বেগে অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা চলতে দেওয়া
হলে এক-একটি বছর কাটবে আর আমাদের দেশের নিরাপত্তা হবে আরও
কম, বেশি নয়।"

এ উপলব্ধি কি ঘটত যদি আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক একচ্ছত্রা-
ধিপত্য না ভাঙত? রাসেলই তো বলেছেন, "পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র ছিল শুধু
এক পক্ষে...তাই আশা ছিল...।"

কিন্তু এখন অপর পক্ষ হয়তো পারমাণবিক শ্রেষ্ঠত্বই লাভ করেছে। পার-
মাণবিক শ্রেষ্ঠত্ব আজ যে রকেটের উপর নির্ভরশীল তার আয়তন আর
নির্ভুলতার শ্রেষ্ঠত্ব তো তর্কাতীতই হয়ে গেছে। সেই অপর পক্ষ সর্বতোভাবেই
অন্তত সমতা লাভ করেছে, তা নিয়ে তো কথাই নেই। নইলে কি ভাইস্‌-

নারদের ও "ওয়াকিবহাল মহলে" ঐ উপলব্ধি ঘটত? রাসেল মত বদলাতেন? প্রিষ্টলে শিল্প-কলার মুক্তি-সাধনের লড়াইয়ে অ্যাটমবোমার হাতিয়ার ত্যাগ করতেন?

পারমাণবিক অস্ত্রবিহীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে নাগাসাকি হিরোশিমায় অনুষ্ঠিত 'পরীক্ষা' দেখিয়ে কম আহ্বান জানানো হয়নি নতি স্বীকার করবার জন্যে!

জাতিসংঘের 'রাজনৈতিক এবং নিরাপত্তা কমিশন'-এর সুপারিশ অনুসারে ১৯৪৬ সালের ২৪এ জানুয়ারি তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে 'পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ কমিশন' বসাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল; সেই বছরই মার্চ মাসে আমেরিকার ফুলটন-এ গিয়ে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল হিটলারের "পবিত্র আর্যজাতি" স্থলে "ইংরেজী ভাষাভাষী জাতিগুলিরই" পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবার একমাত্র অধিকার ঘোষণা করে, কম্যুনিস্টবিরোধী জেহাদ ঘোষণা করে বললেন, তাঁরা যাকে বলেন "স্বাধীনতা আর মানবাধিকারের মহান নীতি" তার পক্ষে যে কোনো বাধা এলে পৃথিবীর সর্বনাশ হবে—চার্চিলদের অ্যাটমবোমার ঘায়ে পৃথিবীটা ফিরে যাবে প্রস্তরযুগের বর্বরতার মধ্যে। সেই বছরই জুন মাসে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের বারুচ পরিকল্পনা মারফত সোভিয়েত ইউনিয়ন সমেত সমস্ত দেশের পারমাণবিক শক্তির মূল কাঁচামাল (ইউরেনিয়ম ইত্যাদি) মার্কিন-নিয়ন্ত্রিত সংস্থার হাতে নেবার প্রস্তাবে অ্যাটমবোমা বিনষ্ট করবার কাজ অনির্দিষ্ট এবং অসম্ভব করে রেখে সেই প্রস্তাবের পিঠেপিঠেই বিকিনিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মার্কিন পারমাণবিক যুদ্ধের মহড়া দেখানো হল—তবু সোভিয়েত ইউনিয়ন নতি স্বীকার করল না। হিরোশিমা-নাগাসাকি বিস্ফোরণে 'ঠাণ্ডাযুদ্ধের' বিকট ঘোষণার পর প্রস্তরযুগীয় বর্বরতা বর্ষণের চার্চিলী দম্ভোক্তি দিয়ে বিকিনির বিকট গর্জন তুলে বারুচ পরিকল্পনারূপী 'চরমপত্র' দিয়েও পারমাণবিক-অস্ত্র-বিহীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে নতি স্বীকার করানো গেল না।

তখনকার রাসেল এবং প্রিস্টলেরা যে-মানবতার জিগির তুলে, আর শিল্প-কলার যে-মুক্তির ধ্বজা উড়িয়ে প্রচার চালাচ্ছিলেন তা দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পারমাণবিক শক্তি আয়ত্ত করা থেকেও নিরস্ত করা গেল না, বরং সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক শক্তি-দৈত্যটাকে বোমায় পুরে হিরোশিমা নাগাসাকি আর বিকিনির দানবদের উন্মত্ততার বিরুদ্ধে প্রহরায়

বসাল, তেমনি সর্বপ্রথম তারাই সে দৈত্যটাকে বশ মানিয়ে, লাগিয়ে দিল মানুষের সেবায়: সেই হল পৃথিবীর প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতি বা শান্তির কর্মনীতির সঙ্গে পারমাণবিক শক্তির সেই পরম-কল্যাণরূপ মিলে পৃথিবীতে শান্তির কামনা বৃহত্তম গণ-আন্দোলনের রূপ ধারণ করল। ট্রুম্যানেরা আর চার্চিলেরা, তখনকার রাসেলেরা আর প্রিস্টলেরা মানবতা এবং মুক্তির নামে যে দানবীয় পৈশাচিকতার কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নকে, সমগ্র পৃথিবীকে আত্মসমর্পণ করবার জন্যে 'চরমপত্র' দিচ্ছিলেন, তা প্রত্যাখ্যান করবার হিম্মত পৃথিবীতে এসেছিল এইভাবেই।

রাসেলেরা আর প্রিস্টলেরা সেদিন যদি অপপ্রচারের আঘাতে আঘাতে, "প্রতিবাদ আর বিক্ষোভের" ঝড় তুলে সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিরস্ত করে নিরস্ত্র রাখতে পারতেন তাহলে ট্রুম্যান-চার্চিলদের মনস্কামনা পূর্ণ হত—সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক শ্মশানে পরিণত হত, সোভিয়েত ব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত পৃথিবী থেকে।

এবং সোভিয়েত ব্যবস্থাটাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জাতীয় লক্ষ্য গ্রহণ করে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের পেণ্টাগনের মুখপত্রগুলি ও মুখপাত্রদের আজ এত কঠিন অবস্থায় পড়তে হত না, সেদিনকার রাসেলদের আর প্রিস্টলেদের অ্যাটমবোমার মানবিকতা, সংস্কৃতির অভিযান যদি সফল হত।

তা সফল হয় নি। তাই ইতিমধ্যে নতুন নতুন '১৯৪৮-এর রাসেল' আর নতুন নতুন '১৯৫২-র প্রিস্টলে'র বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম জার্মানিতে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে পৃথিবীর চিরশত্রু জার্মান সমরবাদ আর নাৎসী যুদ্ধযন্ত্রটিকে। পশ্চিম জার্মান সশস্ত্র শক্তির মোট ১৪০জন জেনারেল আর অ্যাডমিরালের প্রত্যেককেই হিটলারের জেনারেল আর অ্যাডমিরালদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে নেওয়া হয়েছে। সেই জেনারেলরাই অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার প্রধান প্রধান পদে। সেই জেনারেলদেরই একজন—হেউসিঙ্গার—এখন ওয়াশিংটনে ঐ সামরিক চুক্তি সংস্থার স্থায়ী সামরিক (পরিকল্পনা রচয়িতা) কমিটির চেয়ারম্যান। সেই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে রকেট অস্ত্রশস্ত্র এবং অ্যাটম আর হাইড্রোজেন বোমা তুলে দেওয়া হচ্ছে সেই নাৎসী যুদ্ধযন্ত্রের হাতে—যারা জার্মানির "১৯৩৭ সালের সীমান্ত অনুযায়ী রাইখের উত্তরাধিকারী" হিসাবে নিজেদের জাহির করছে দম্ভভরে, যারা

হিটলারের পরাজয়ের প্রতিশোধ প্রকাশ্যেই দাবি করছে, যাদের সীমান্ত-পরিবর্তন প্রস্তুতি আর প্রতিহিংসা কামনা দেখে আজ সেই রাসেলেরা এবং প্রিস্টলেরাও সন্ত্রস্ত।

হিটলারেরই সেই যুদ্ধযন্ত্র পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে, সমগ্র সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াকে নিশ্চিহ্ন করতে চাইলেও নিশ্চেষ্ট থাকতে হবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে—যে সোভিয়েত ইউনিয়নে ঐ একই দানবের আক্রমণে সৈন্যক্ষয়ই হয়েছিল মার্কিন-বৃটিশ যুক্ত অঙ্কের বারো গুণ বেশি, নিযুত-নিযুত নরনারী আর শিশু হয়েছিল অপহৃত, নির্যাতিত এবং গণহত্যার শিকার; যে-সোভিয়েত ইউনিয়নে বোধহয় একটি পরিবার নেই যার প্রিয়জন নিহত হয় নি ঐ দানবদের হাতে। সেই সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিরস্ত, আপেক্ষিক-নিরস্ত্র থাকতে আহ্বান জানাতে পারে কে? সে জেনে হোক, অজ্ঞাতসারে হোক, সেই ১৯৪৮-এর রাসেল আর ১৯৫১-র প্রিস্টলের অ্যাটমবোমার মানবতা আর অ্যাটমবোমার সাংস্কৃতিক মুক্তিরই সেবাইত।

পশ্চিম জার্মানিতে পুনরুজ্জীবিত নাৎসী যুদ্ধযন্ত্রটাতে তৃতীয় মহাযুদ্ধেরই সর্বনাশ ঠাসা রয়েছে। সেই একই হেউসিঙ্গার আর স্পিডেলরা তার আস্ফালন করছে। মার্কিন-বৃটিশ-ফরাসী যুদ্ধকামীরাই এই পুনরুজ্জীবনদাতা। কাইজারের আমল থেকে ছয়-পুরুষের মৃত্যু-ব্যবসায়ী ক্রুপস্ এবং হিটলারের যুদ্ধযন্ত্রের সমস্ত অর্থনৈতিক ভিত্তি সেখানে পুনরুজ্জীবিত এবং আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে ঐ একই মার্কিন-বৃটিশ-ফরাসী আনুকূল্যে। তা তো রোধ করা সম্ভব হয় নি। এটাই বাস্তবতা।

শুধু তাই নয়। তার পেছনে এবং নেতৃত্বে রয়েছে আরও বড় যুদ্ধ-যন্ত্র—পেণ্টাগন, যার ফাশিস্ট প্রকৃতি দ্রুত বাড়তে দেখে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে সেনেটের 'পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কমিটি'র সভাপতি ম্যান্সফীল্ডের মতো ব্যক্তিকেও প্রকাশ্যে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করতে হয়েছে। সেই পেণ্টাগনের উদ্যোগে মার্কিন সরকারী কর্তৃপক্ষ কি ভাবে পারমাণবিক মহাযুদ্ধ অনিবার্য করে তুলবার মনোবিকার সৃষ্টি করছে সমগ্র দেশে, তা নিজের চোখে দেখে বিবরণ লিখে পাঠিয়েছেন লণ্ডনের 'নিউ স্টেট্সম্যান' পত্রিকার বিশিষ্ট সাংবাদিক কিংস্‌লে মার্টিন, যাঁকে "কমিউনিস্ট ঘেঁষা" নাম দিতে ৎশোম্বেরও আটকাবে। সে-দেশে

'কু-ক্লুক্স-ক্ল্যান', 'জন বার্চ সোসাইটি', 'আমেরিকান ফাশিস্ট পার্টি' প্রভৃতি মিলে সরকারী কর্মনীতি দিয়ে তৈরি জমিনে যে-ব্যাপক ফাশিস্ট আন্দোলন গড়ে তুলেছে, তা দেখে মার্কিন "মুক্ত গণতন্ত্রের" বহু প্রচারককেও আজ পশ্চিমে, এ দেশে, গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করতে হচ্ছে। এ পরিস্থিতি তো রোধ করা যায় না। এটাই পৃথিবীর বাস্তবতা।

তৃতীয় মহাযুদ্ধের বিপদে ঠাসা এই বাস্তবতা। আজ তৃতীয় মহাযুদ্ধ মানে যে-মৃত্যু তা কোটির অঙ্কে প্রকাশ করতে হলেও ক-কুড়ি কোটি, সেই পদ্ধতির শরণ নিতে হয়। পেণ্টাগণ আর নাৎসী যুদ্ধযন্ত্র মিলে মানুষের সভ্যতার কেন্দ্রগুলিকে, আশা-আকাঙ্ক্ষার বনিয়াদগুলিকে, স্বপ্নের সূত্রগুলিকে, জীবনের অঙ্কুর অবধি এই যে পারমাণবিক ভস্মস্তূপে পরিণত করতে চাইছে—সেই ধ্বংসস্তূপের উপর অবশিষ্ট প্রাণ আর প্রাণীদেহেও পুরুষানুক্রমিক পারমাণবিক মৃত্যুধারা সঞ্চারিত করে দিতে চাইছে, তার চেয়ে ভয়ঙ্কর চেষ্টা কি আর হয়েছে কখনও কিংবা হতে পারে?

এই নিদারুণ সর্বনাশকে নিয়তির মতো দুর্বার বলে মেনে নিতে হবে? এই নিদারুণ বাস্তবতাকে ঝুঁটি ধরে টান মেরে বদলে দেবার যে কোনো উপায় অবলম্বন করা হবে না? পৃথিবীর সমস্ত মানুষের আবেদনে, দাবিতে, ক্রোধে দানবকে নিরস্ত করা যায় নি। সে পৃথিবী থেকে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র এবং সমস্ত অস্ত্রকে বিদায় করতে দেবে না কিছুতেই। সে তার হাইড্রোজেন-বোমারু বিমানবহর সর্বক্ষণ উড়িয়ে রেখে, ঐ মৃত্যুবর্ষী শকুনীর ঝাঁকটার পরিচালক মণ্ডলীটিকে গর্তে লুকিয়ে রেখে সেখান থেকে পৃথিবীকে আক্রমণ করতে চাইছে তৃতীয় মহাযুদ্ধ দিয়ে। সে-দানবটাকে তো অন্য কোনো উপায়ে নিরস্ত করা যায় নি। তার বিকারগ্রস্ত উত্তপ্ত মস্তিষ্ক একটু শীতল করার কোনো উপায় থাকলে তো তা প্রয়োগ করা চাই-ই। পৃথিবীর উপর তৃতীয় মহাযুদ্ধের আক্রমণ চালাতে গেলে গভীরতম বিবরেও মৃত্যু-ব্যবসায়ীদের সোনার তাল আর তাদের শিরোমণিদের জীবন রক্ষা পাবে না, তাদের মাথায় এই উপলব্ধিটা সবলে ঢুকিয়ে দেওয়া ছাড়া আর তো কোনো পথ নেই। সর্বমানবের শুভেচ্ছায় তো ফল হয় নি। এই তো সেদিনও ঐ-দানব জাতিসংঘের দরবারে দাঁড়িয়ে, জাতিসংঘেরই ঘোষিত অনুজ্ঞা উপেক্ষা করে বলেছে, "না, হাইড্রোজেনবোমা প্রয়োগ করার অধিকার আর দায়-দায়িত্ব" ছাড়ব না। জাতিসংঘেরই অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করে সে বলেছে, "না, আফ্রিকায় পারমাণবিক বিস্ফোরণ

করতে থাকব, আফ্রিকা থেকে পারমাণবিক যুদ্ধ ঘাটি অপসারিত
করব না।"

সেই দানবের মাথায় যদি ঢুকিয়ে দেওয়া যায় যে, গভীরতম বিবরে
প্রবেশ করেও সে পৃথিবীতে সর্বনাশ ছড়িয়ে দেবার পর নিস্তার পাবে
না, একমাত্র তবেই তার মাথা একটু ঠাণ্ডা হতে পারে। একমাত্র তবেই
সে বুঝবে যে—আমেরিকার চার, আট, কিংবা ষোল কোটি মানুষকে বলি
দিয়েও সে তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধিয়ে কোথাও গিয়ে নিস্তার পাবে না।
সোভিয়েত ইউনিয়নের পঞ্চাশ কিংবা আরও কিছু বেশি পরিমাণ মেগাটন
মাত্রার বিস্ফোরণ তার মাথায় সেই উপলব্ধিটাকে ঢুকিয়ে দিতে পারে, তাতে
পৃথিবীর কয়েক কুড়ি কোটি মানুষের জীবন বাঁচবে, কিন্তু "তার ফলে উদ্ভূত
তেজস্ক্রিয়তা এত সামান্য যে বৃটিশ বিজ্ঞানী মহলগুলিও মনে করছেন যে,
এ বুঝি সেই নিউট্রন বোমা" (স্টেট্‌স্‌ম্যান) এবং বৃটিশ সরকার প্রথম
দফায় অনেক আতঙ্কের অপপ্রচার চালাবার পর তাঁদের সরকারী বিজ্ঞানীরাও
বলেছেন যে, সোভিয়েত পঞ্চাশ মেগাটন পরীক্ষার পর দুধে তেজস্ক্রিয়
আয়োডিনের পরিমাণ কমে গেল! সোভিয়েত সরকার যে যুদ্ধবিকারগ্রস্তদের
উত্তপ্ত মস্তিষ্ক একটু শীতল করার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করে—প্রস্তাবিত
জার্মান শান্তি-চুক্তির বিরুদ্ধে কেনেডি আর আদেনাউয়ার আর ম্যাকমিলান
আর দ্যগলদের সরকারগুলির উগ্রতম যুদ্ধ-প্রস্তুতির মুখে—ঘন ঘন প্রকাশ্য
পারমাণবিক আক্রমণ হুমকির পর বাধ্য হয়ে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা
আবার আরম্ভ করবার সিদ্ধান্তের সঙ্গেই বলেছিলেন, তেজস্ক্রিয় কণাপাত
যাতে সর্বনিম্ন মাত্রায় হয়, সে দিকে নজর রাখা হচ্ছে, তার সত্যতা এবং
কার্যকারিতা তো বৃটিশ সরকারী বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতিতে (এবং আমাদের
দেশে অধ্যাপক সত্যেন বসুর মতো বিজ্ঞানীর বিবৃতিতে) প্রমাণিত হল।

পেন্টাগন আর পশ্চিম জার্মান যুদ্ধযন্ত্র অতর্কিত আক্রমণের যে হিসাব
কষছিল তাতে অন্তত কিছু গোলমাল বেধে যাবার প্রমাণ আছে। "সীমা-
বদ্ধ" পারমাণবিক আক্রমণ চালিয়ে বার্লিন সমস্যা "সমাধানের" পথ নির্দেশ
করা হচ্ছিল 'ওঅল স্ট্রীট জার্নাল'-এর মতো প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী আমেরিকান
পত্রিকায়, কিন্তু তা ছাড়াই পশ্চিমীদের আলাপ-আলোচনায় বসবার দিকে
ঝোঁকটাই বরং ইতিমধ্যে বেড়েছে। কত মেগাটনের কটা আঘাত অতর্কিতে
হানলে সোভিয়েত ইউনিয়ন পাল্টা আঘাত হেনেও আর এঁটে উঠতে পারবে

না বলে যে-মার্কিন হিসাব চলছিল সেটা পঞ্চাশ এবং আরও বেশি মেগাটন বোমার অস্তিত্বের ফলেই লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে দ্বিতীয়বার চিন্তা করে অনেকেই মনে করতে আরম্ভ করেছেন যে, বড় বিপদ কোন্‌টা—সোভিয়েত পারমাণবিক পরীক্ষার বিতর্কমূলক তেজস্ক্রিয়তা, না, মার্কিন-পশ্চিম জার্মান অতর্কিত আক্রমণ দিয়ে বাধানো তৃতীয় মহাযুদ্ধে কয়েক কুড়ি কোটি মানুষের মৃত্যু!

পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা পুনরারম্ভের সোভিয়েত সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার (৩০শে আগস্ট) অনেক আগে থেকেই সারা পৃথিবীর জানা ছিল যে, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র যে কোনো মুহূর্তে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা আরম্ভ করবে। বহু সরকারী বিবৃতিতেও তার আভাস এবং পেন্টাগনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মহল থেকে প্রকাশিত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা সবারই জানা ছিল। তবু শত সতর্কতা সত্ত্বেও যেটুকু তেজস্ক্রিয়তা উদ্ভূত হতে পারে তার অনিষ্টকারিতা জেনেও, বহু সৎ শুভেচ্ছাপ্রণোদিত নরনারীও ভুল বুঝে বিক্ষুব্ধ হতে পারেন তা বুঝেও ('মার্কিন পরীক্ষা' অচিরেই আরম্ভ হত, তখন সেই "সুযোগে" সোভিয়েত 'পরীক্ষা' পুনরারম্ভ করতে কারও ভুল বোঝাবুঝিরও যুক্তি থাকত না) সোভিয়েত ইউনিয়ন যে অগ্রণী হয়ে 'পরীক্ষা' আরম্ভ করলেন—সেটা অকারণে নয়। অতর্কিত আক্রমণ আশঙ্কার শত পরিস্থিতিগত প্রমাণ ছাড়াও সুনির্দিষ্ট তথ্যও ছিল: আমেরিকান এয়ারফোর্স অ্যাসোসিয়েশনের পরিকল্পনা, পশ্চিম জার্মানিতে ক্রিশ্চিয়ান ডেমক্রেটিক এবং ফ্রী ডেমক্রেটিক পার্টির নতুন কোয়ালিশন সরকার গঠনের আগে দুই পার্টির মধ্যে গোপন রফার প্রকাশিত ব্যবস্থাবলী ইত্যাদি। তৃতীয় মহাযুদ্ধ অর্থাৎ পৃথিবীর পারমাণবিক সর্বনাশের আশঙ্কায় আমাদের দেশের সরকারী নেতারাও যেসব কথা বলে থাকেন, তা তো শুধু কথার কথা নয়। এবং সে আশঙ্কা থাকলে সোভিয়েত দেশের মানুষের, তাদের সরকারের কতখানি সতর্ক এবং সক্রিয় হওয়া কর্তব্য তা কি তাদের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভীষণ অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করলে স্পষ্ট হয়ে যায় না?

সোভিয়েত ইউনিয়নের এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার বাস্তব সামরিক প্রয়োজনই ছিল, সেটা আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কেনেডি এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলানের বিবৃতিতেও স্বীকৃত হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, এখন তাঁদেরও বায়ুমণ্ডলে পারমাণবিক বিস্ফোরণ করবার "প্রয়োজন হতে পারে।" আগে তাঁরা বলছিলেন, সোভিয়েত 'পরীক্ষার' কোনো সামরিক

প্রয়োজন ছিল না—ওটা নাকি শুধু আতঙ্ক সৃষ্টি করবার জন্যে, যদিও যারা আক্রমণেচ্ছু তারা ছাড়া আর কারও আতঙ্কিত হবার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

পশ্চিমীরা এবং তাঁদের সমর্থকেরা বলেছিলেন, সোভিয়েত 'পরীক্ষা'র ফলে সর্বনাশ হয়ে গেল, তবু এখন তাঁরা সেই 'পরীক্ষা'ই চালাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছেন! এমনকি বলছেন, "পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ করবার আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই পারমাণবিক বিস্ফোরণ চালিয়ে যাব।" তাতে যাঁরা প্রতিবাদ করছেন না, কি বিপদ দেখছেন না, তাঁরা এর আগে যা করছিলেন সেটা পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তার আশঙ্কায়, না শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতা করবার কোনো বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে? বায়ুমণ্ডলে পারমাণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করে তার নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা স্থাপন করার যে-প্রস্তাব করা হয়েছিল কেনেডি-ম্যাকমিলান যুক্ত বিবৃতিতে গত ৩রা সেপ্টেম্বর, ঠিক সেই প্রস্তাবেরই ভিত্তিতে 'পরীক্ষা' নিষিদ্ধ করবার সোভিয়েত পরিকল্পনাটিকে মার্কিন-বৃটিশ পক্ষ গত ২৭শে নভেম্বর জেনেভায় প্রত্যাখ্যান করলেন—সেটা কি তাঁদের 'পরীক্ষা'র বিরোধী মনোভাবের পরিচয়? সোভিয়েত 'পরীক্ষা'র বিরুদ্ধে তাঁরা যত প্রচার চালাচ্ছিলেন, সেটাকে তাঁরা নিজেরাই তো অপপ্রচারের ভস্মরাশি বলে প্রতিপন্ন করে দিলেন। কিন্তু সেই অপপ্রচারেরই ভস্মরাশি উড়িয়ে উড়িয়ে আমাদের দেশকেও 'ঠাণ্ডাযুদ্ধের' বিষের আবহাওয়ায় দূষিত করে তুলবার কি ব্যর্থ সমারোহই না দেখা গেল!

সাম্প্রতিক সাহিত্য

সিভিলিয়নের আত্মকথা

প্রদ্যোৎ গুহ

প্রাচ্যবিদ ও ভাষাতাত্ত্বিকদের একটা সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠির মধ্যে জন বিমসের নাম হয়তো অপরিচিত নয়। এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তাঁর ভারততত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাদি অনেকেরই চোখে পড়ে থাকবে।

গ্রীক, লাতিন, জর্মান, ফরাসী, স্প্যানিশ প্রভৃতি ইওরোপীয় ভাষা ছাড়াও অনেকগুলি ভারতীয় ভাষায় বিমস্ পারদর্শী ছিলেন। তিনি তিন খণ্ডে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাসমূহের একটি তুলনামূলক ব্যাকরণ (১৮৭২-৭৯) রচনা করেছিলেন। তাঁর বাংলাভাষার ব্যাকরণ (১৮৯১) ১৯২২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে নিযুক্ত আই. সি. এস. শিক্ষানবীশদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল। বিমস্ তুর্কী ভাষা থেকে বাবরের স্মৃতিকথার ইংরেজি তরজমা করেছিলেন এবং ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ভূগোল (অসমাপ্ত) রচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন। এসব তথ্য হয়তো অনেকের জানা ছিল কিন্তু বিমস্ যে একটি আত্মচরিত রচনা করে গিয়েছিলেন এবং তা যে পূর্ব-ভারত সম্পর্কে একটি তথ্যের স্বর্ণখনিবিশেষ তা হয়তো অনেকেই জানতেন না।

বিমস্ তাঁর আত্মচরিত লিখতে শুরু করেন ১৮৭৫ সালে কিন্তু কাজের চাপে লেখা এগোয় মন্দ-মন্থর গতিতে এবং শেষপর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৯৮ সালে অবসর গ্রহণের পর পুনরায় তিনি লেখার কাজে হাত দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে লেখা শেষ করে যেতে পারেন নি। ১৯০২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিমস্ তাঁর আত্মচরিত প্রকাশের জন্য লেখেন নি, লিখেছিলেন প্রধানত নিজের পরিবার-পরিজনদের জন্য যাতে তাঁর "উত্তরপুরুষেরা জানতে পারে তাদের পূর্বপুরুষরা কিভাবে দিনযাত্রা নির্বাহ করত।" বিমসের পাণ্ডুলিপি তাই এতকাল পারিবারিক দলিল-দস্তাবেজের মধ্যেই চাপা পড়েছিল।

সম্প্রতি ফিলিপ মেসন ভারতীয় সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে প্রাক্তন সিভিলিয়ানদের চিঠিপত্র, ডায়েরি ইত্যাদির খোঁজখবর করতে গিয়ে পাণ্ডুলিপিটির সন্ধান পান এবং পড়ে মুগ্ধ হয়ে যান। মেসন তাঁর বইয়ে পাণ্ডুলিপিটি থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রধানত মেসনের এই আবিষ্কারের ফলেই বিমসের মৃত্যুর ৫৯ বৎসর পরে তাঁর সেই অসমাপ্ত আত্মচরিত 'জনৈক বেঙ্গল সিভিলিয়নের স্মৃতিকথা' নামে বিলেত থেকে এই বছর প্রকাশিত হয়েছে।

বিমস্ ছিলেন কোম্পানি-নিযুক্ত সিভিলিয়নদের শেষ দলের অন্যতম। কার্যব্যাপদেশে তিনি প্রথমে পাঞ্জাবে, পরে ওড়িষ্যা এবং সর্বশেষে বাংলাদেশে প্রায় ৩৫ বৎসরকাল কাটিয়েছেন। ১৮৯৩ সালে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার হিসাবে কায অবসর গ্রহণ করে তিনি বিলেত ফিরে যান। মধ্যে কিছুকাল তিনি 'বোর্ড অব রেভিনিউ'তেও কাজ করেছেন।

বিমস্ 'প্রাসাদপুরী' কলকাতা সে পৌছেছিলেন ১৮৫৮ সালের ১৮ই মার্চ। তখনও তথাকথিত 'মিউটিনি'র হাঙ্গামা সম্পূর্ণ প্রশমিত হয় নি। রানী ভিক্টোরিয়া সম্রাজ্ঞী পদে বৃতা হয়ে ভারতবর্ষের শাসনভার স্বহস্তে তুলে নেন নি। তখনও ভারতবর্ষে কোম্পানির রাজত্ব চলছে।

বিমস্ তাঁর আত্মচরিতের ভূমিকায় লিখেছেন, "যে ভারতবর্ষে আমি আমার জীবনের এত বড় একটা অংশ কাটিয়ে এসেছি আজ তা একটা বিপুল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তখন জীবনযাত্রার যে অবস্থা ছিল, যে সব প্রতিষ্ঠান বর্তমান ছিল তার অনেক কিছুই আজ আর নেই। আমার জীবনের যে অংশ ভারতে অতিবাহিত হয়েছে তার বিবরণ সেই অধুনা বিলুপ্ত অবস্থার বিবরণ হিসাবেই হয়তো কাজে আসবে।"

বিমস্ সত্যিকথাই লিখেছেন। তিনি যে সময় ভারতবর্ষে এসেছিলেন তা ছিল একটা পর্বান্তের যুগ। 'মিউটিনি' পরবর্তীকালে, ১৮৫৮-৫৯ সালে, ভারতবর্ষ শুধু যে তার নামমাত্র সার্বভৌমত্ব হারিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে উঠেছিল তাই নয়, তখন একশ বছরের কোম্পানির শাসনেরও অবসান হয়েছিল। কোম্পানির আমল ছিল বৃটিশের রাজ্যবিস্তারের কাল। 'মিউটিনি'-পরবর্তীকালে যে যুগের সূচনা হল তাকে বলা যেতে পারে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সংহতিসাধনের যুগ। সেই যুগে বৃটিশ শাসনব্যবস্থা কিভাবে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করল, শাসন এবং বিচারব্যবস্থা কিরকম ছিল

দেশের অবস্থা কি ছিল, সাধারণ মানুষ কিভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত বিশেষ করে পাঞ্জাব, বিহার, ওড়িষ্যা ও বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায় তার একটা প্রামাণ্য চিত্র পাওয়া যায় বিমসের আত্মচরিতে।

বিমস্ কার্যব্যাপদেশে যখনই কোনো নতুন অঞ্চলে গেছেন আত্মকাহিনীতে তার বিবরণ দিতে গিয়ে সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, সাধারণ লোকেদের জীবনযাত্রার ধরন, ভূমিব্যবস্থা এবং শাসনতান্ত্রিক সমস্যার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সেকালে রাজপুরুষরা এবং সাধারণভাবে শ্বেতাঙ্গ-সমাজ কিভাবে দিন কাটাত তারও একটা তথ্যনিষ্ঠ চিত্র পাওয়া যায় বিমসের স্মৃতিকথায়। ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে বিমসের আত্মচরিতের গুরুত্ব এই কারণেই।

ভারতবর্ষে বিমসের কর্মজীবনের শেষ পনেরো বছর কেটেছে বাংলাদেশে। তার মধ্যে মাত্র এক বছরের বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই এক বছর তিনি ছিলেন চট্টগ্রামে। বাকী চোদ্দ বছর তিনি কাটিয়েছেন চুঁচুড়া, বর্ধমান, ভাগলপুর ও কলকাতায়। আত্মকাহিনীর এই অধ্যায় বিমস্ লিখে যেতে পারেন নি—এটা আমাদের পক্ষে বিশেষ আফশোসের কথা। এই সময় বাংলাদেশে শ্বেতাঙ্গদের ইলবার্ট বিলবিরোধী আন্দোলন প্রবল হয়েছিল। এডুকেশন কমিশন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করছিল। বিমস্ কমিশনে সরকারের পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা তার বিবরণ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তাছাড়া, এই অধ্যায় লিখিত হলে তাতে নিশ্চয়ই সেকালের বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের সম্পর্কেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেত।

বিমসের দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিকের হলেও তাঁর কলম ছিল সাহিত্যিকের। তাঁর আত্মকাহিনী তাই উপন্যাস ফেলে রেখে পড়তে হয়। নীলকরদের অনাচারের কাহিনী আমাদের অজানা নয়, কিন্তু বিমস্ যখন তাদের ছবি আঁকেন তা যেন ইতিহাসের পাতা থেকে কায়া পরিগ্রহ করে উঠে আসে। সেকালের অযৌক্তিক লবণ আইনের বিরুদ্ধে বিমস্ যে সংগ্রাম করেছিলেন, যার ফলে এই আইনের কড়াকড়ি কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল তার বিবরণও গল্পের মতো পড়া যায়। কিভাবে সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরি করা হত এই প্রসঙ্গে বিমস্ তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। উদয়গিরির বৌদ্ধ (জৈন ?) ধ্বংসাবশেষ বিমস্ আবিষ্কার করেছিলেন। তারও মনোজ্ঞ বিবরণ আছে এই

স্মৃতিকথায়। আর এই সব তথ্যের মাঝে মাঝে বিমস্ কালি-কলমে নানা মানুষের এমন সব জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন যে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। কলকাতা-সমাজের প্রজাপতি-স্বভাবা লুলু, কিংবা 'প্রাচীন নাবিক' অ্যালফ্রেড বণ্ড কিংবা পরোপকারী শ্রীমতী হাওয়েকে ভোলা অসম্ভব।

গ্রন্থ-পরিচিতিতে ফিলিপ মেসন ঠিকই লিখেছেন, লেখার ক্ষমতা বিমসের প্রায় বিধিদত্ত। তাঁর মন স্বচ্ছ, কী বলবেন তিনি তা ভাল করেই জানেন এবং নির্দিধায় তা বলেন। ট্রলপের মতো তিনি দ্রুত লিখতে অভ্যস্ত ছিলেন, থেমে থেমে 'জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বা কলমের পেছন কামড়ে কামড়ে' তাঁকে লিখতে হত না।

তাঁর ইংরেজি সহজ-সরল, মোটেই ভিক্টোরীয় যুগের মতো কটমট নয়। কার্লাইল রাস্কিনের যুগের লেখক হলেও তাঁর ভাষা সুইফট, ডিফোর মতোই সরল এবং প্রসাদগুণসম্পন্ন।

Memoirs of a Bengal Civilian : John Beames. Chatto & Windus. London. 30 Sh.

পুস্তক পরিচয়

ইলিশমারির চর ॥ আবদুল জব্বার। ইউনিভার্সাল বুক ডিপো। পাঁচ টাকা ॥

নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস রচনায় বাংলাসাহিত্যের কৌলিন্যের সার্থক উত্তরসূরী আবদুল জব্বার। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ইলিশমারির চর' সাহিত্যে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। বইটি পশ্চিম বাংলার মৎস্য-জীবীদের জীবনযন্ত্রণার চিত্রল শব্দলিপি।

উপন্যাসটি নদীমাতৃক। জয়নদ্দি-হরেন-কানাই-কাশেম ও তাদের প্রতি-দিনের জগতের শক্তিশালী পরিপ্রেক্ষিতই হল নদী। মূল চরিত্র জয়নদ্দি পুরুষানুক্রমে মৎস্যজীবী তাই তার জীবনসংগ্রামে নদীর ভূমিকা অবধারিত ও অনস্বীকার্য। গ্রামীন সমাজের স্বাভাবিক নিয়মে মহাজন তরবদির বলি হয় ধর্মপ্রাণ, সহজবিশ্বাসী মৎস্যজীবীরা। জয়নদ্দি, হরেন ও কানাইয়ের হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রমের মূল্যে কামড় বসায় তরবদি। সহস্রবাহুতে শোষণ করে।

তরবদির শোষণের ভয়াবহ রূপ চঞ্চল করে জয়নদ্দিকে। সে মহাজন তারিণীর কাছে নৌকা জমা নেয়, তরবদির সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে। তারপর গ্রামে দেখা দেয় অন্য এক চেতনা। তারিণীর শিক্ষিত ছেলে রতন, তার বন্ধু আনোয়ার, মেয়ে রোহিণীর সঙ্গে আসে শিক্ষা ও শ্রেণীচেতনার ঢেউ। প্রচলিত জীবনস্রোতে বাধা পড়ে। অন্ধ আদিমতা, তাড়ির নেশা ও ধুঁকে ধুঁকে নিজেদের নিঃশেষ করার দিন শেষ হয়ে দেখা দেয় জীবনের মূল্য নির্ণয়ের নতুন ক্ষণ। মাঝে মাঝে মামলাবাজ তরবদির অসুস্থ উন্মত্ততা প্রকট হয়। গ্রামে নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠায় অন্যতর চেতনার জোয়ার আসে। কার্তিকের শেষ। একটু একটু শীত পড়তে শুরু করেছে। সমুদ্রযাত্রার দিন আসে। জয়নদ্দি-হরেন-কাশেমরা পাঁচপীরের নাম করে নৌকা ছাড়ে বদর

বদর। আর চোখের জল মুছতে মুছতে যে যার বাড়ি চলে যায় সিন্ধু, শাকিনা, কাশেমের মা, জয়নদ্দির মা।

একটার পর একটা দিন এগিয়ে চলে ধীরে ধীরে। ইতিমধ্যে লোভী তরবদির অনুচরেরা একদিন গভীর রাতে হানা দেয় সিন্ধুর ঘরে। সন্তানসম্ভবা সিন্ধুর আর্তনাদ তাদের জান্তব পিপাসাকে আরও প্রকট করে, প্রাণহীন সিন্ধুর দেহটাকে খালের ধারে পুঁতে রাখে। তরবদির এই চক্রান্ত ধরা পড়ে যখন সমুদ্র থেকে ফিরে আসে জয়নদ্দির দল। প্রতিশোধের জ্বালায় পাগল সাজে হরেন। তারপর একদিন পাগলামির ভান করে খুন করে হরেন তরবদিকে। মহাজন তারিণীর ব্যবস্থায় ছাড়া পায় হরেন।

পরদিন ভোর না হতেই শাকিনা ডেকে তোলে জয়নদ্দিকে। এতদিনের পরিশ্রমে ছোটখাটো মহাজন হয়েছে সে। মায়ের পায়ে সালাম করে তারা বেরিয়ে পড়ে নদীতে।

জয়নদ্দি নৌকোয় উঠে দাঁড়ায়। আশ্চর্য হয়ে দেখে ইলিশমারির চরের সবুজ গাছপালার মাথার ওপর দূরে পূবদিগন্তে রক্তিম আলোর বন্যা ভাসিয়ে দিয়ে উঠেছে নতুন দিনের সূর্য। এক দার্শনিক ভাবনায় ভরে ওঠে তার প্রাণমন।

এই হল কাহিনী। উপন্যাসটি পড়তে পড়তে লেখকের মুন্সীয়ানাকে বার বার অভিনন্দন জানাতে হয়। মূল চরিত্র জয়নদ্দি, স্ত্রী শাকিনা, যৌবনমুখর সিন্ধু, মহাজন তরবদি, রতন, রোহিণী প্রভৃতি চরিত্রগুলির উজ্জ্বল উপস্থিতি পাঠককে কাহিনীর দিগন্তে পৌঁছে দেয়। আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার কোথাও কোথাও প্রকট হলেও ইলিশমারির চরের মৎস্যজীবীদের জীবন বর্ণনায় এর প্রয়োজন ছিল মনে হয়।

শিল্পী খালেদ চৌধুরীর প্রচ্ছদ চিত্রটি সুন্দর।

শ্যামাপ্রসাদ সরকার

চর্যাপদের হরিণী ॥ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মিত্রালয়। তিন টাকা।

শ্রীযুক্ত দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্পকে ইতোমধ্যেই গতানুগতিক কথা[-] সাহিত্যধারা থেকে পৃথক করে তোলার সাধনায় বিশিষ্ট। তিনি ইদানি[ং] নানা বিতর্কের কেন্দ্রবর্তীদের অন্যতম কতকটা এই কারণেই। বর্তমা[ন]

[গল্প]গ্রন্থের শেষ গল্পটি সেই বিতর্কাবর্তের মূল কেন্দ্রের একটি বলে খ্যাতি ও বহুল পরিমাণে অখ্যাতি দুইই অর্জন করেছে। আমরা গল্পগ্রন্থের সমস্ত গল্পগুলির পটভূমিকায় নাম-গল্পটির আলোচনা করব। গল্পগ্রন্থটির মধ্যে গল্পকার দীপেন্দ্র-নাথের একটি বিবর্তন লক্ষণীয়। ভাসানের লেখক ধীরে ধীরে ঘাম নরকের [...]রী এবং চর্যাপদের হরিণী লিখছেন। কয়েকটি পৃথিবী এসব গল্পের আগে লেখা। একটা কথা এরই সঙ্গে মনে হবে, সেটা হল কয়েকটি পৃথিবী এবং [চর্যা]পদের হরিণীই এই গ্রন্থের মধ্যবিত্ত জীবনাশ্রয়ী গল্প। তার মধ্যে কয়েকটি পৃথিবী এই গ্রন্থের দুর্বলতম রচনা। তথাপি এ কথা ঠিক নয় যে কয়েকটি পৃথিবী গল্পে বাস্তবকে অধ্যয়নের প্রকরণগত দুর্বলতাকে অনুধাবন করেই লেখক [চর্যা]পদের হরিণীর নিরীক্ষামূলকতার দিকে ঝুঁকেছেন। এ ঝোঁক বা প্রবণতার [...]স অন্যত্র।

এই ঝোঁক সার্থক কি অসার্থক সে আলোচনার পূর্বে, দীপেন্দ্রনাথের [বাস্ত]বতাবোধ সম্বন্ধে দু একটি কথা—তাঁর গল্পগুলির প্রসঙ্গেই—আলোচিত হওয়া [দর]কার। ভাসানের মতো আবহাওয়া-পরিবেশপ্রবল গল্পে দীপেন্দ্রনাথের শক্তির [...]বনার বিকাশে আমরা নিশ্চয় চমৎকৃত, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ সম্বন্ধে আমাদের [...]া তখনো অমোচিত যে বাস্তবতা বলতে বিশিষ্টভাবে তিনি কী বুঝছেন? [...]ন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও সমরেশ বসু সাহিত্যে পরিবেশ অঙ্কনে নানা সিদ্ধির [...]চয় দিচ্ছিলেন, তখন ভাসানের মতো গল্পে দীপেন্দ্রনাথের নিজস্ব সাফল্য [...]ই শ্রদ্ধেয়—বিশেষ যখন দেখা যায় যে একই সময়ে জন্মভূমি এবং নতুন [সাহি]ত্য শারদীয় সংখ্যায় সমরেশবাবুর গঙ্গা ও দীপেনবাবুর ভাসান প্রকাশিত [...]। কিন্তু লক্ষনীয়—এই সাফল্য সত্ত্বেও তিনি চর্যাপদের হরিণীর মতো [...] সৃষ্টিকারী গল্প লিখেছেন। সাফল্যের স্বর্ণ সড়ক পরিহার করে এই কণ্টক-[...]ার মূলে নিশ্চয় নির্বুদ্ধিতা নয়। সে কারণের মূল সন্ধান করতে গেলে [...] যায় যে ভাসান ছাড়া বাকি সব গল্পেই লেখক যা ধরতে চেয়েছেন তা হল [...]র বিশ্লিষ্টতার যন্ত্রণা। একমাত্র ভাসানেরই বিষয়বস্তু ছিল মানুষের জীবন-[...]কার সমগ্রতাকে মেঘনার মেঘ-বৃষ্টি-রোদের রূপকে ধারণ। ঘাম, নরকের [...]ী এবং চর্যাপদের হরিণীর বিষয় হল সে ক্ষেত্রে মানুষের নিজের [...]-স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতনতা। কাটামুণ্ডুর চোখের জলে প্রকৃত প্রস্তাবে [...] জীবনের বেদনা। বিষ্টুচরণের শেষ স্বপ্নের দর্পণের মিত-পরিসরে তার [...]র ভাঙাচোরা রূপের ছায়া। সুধা এবং তৃপ্তির নাটকীয় বক্তৃতার মধ্যেও

তাই—জীবনের ভগ্নাংশে বিক্ষিপ্ততার আভাস। প্রশ্ন উঠতে পারে যে ভাসান গল্পে জীবন-জীবিকার সমগ্রতাকে সার্থকভাবে ধারণ করেও, জীবনের বিশ্লিষ্টতার যন্ত্রণাকেই বাস্তবাধ্যয়নের প্রকৃষ্ট পন্থা বলে তাঁর মনে হল কেন? এ প্রশ্নের সর্বোত্তম উত্তর অবশ্য শিল্পীর কাছেই লভ্য। কিন্তু শিল্প-গ্রাহীদের নিজেদের কাছেও এ উত্তর হয়তো একেবারে দুর্লভ নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, স্বাধীনতার পরবর্তী কালে মধ্যবিত্ত মানসে নানা ব্যর্থতার ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠেছিল। প্রতিটি ভগ্নাংশেই ছিল ভাঙনের স্বাক্ষর। জীবনের ক্রমবর্ধমান সঙ্কট এই কয়েক বছরে কী আকার ধারণ করেছে, কী পরিমাণে বেড়ে উঠেছে রাশি রাশি আত্মপ্রবঞ্চনার নিদর্শন, তার জন্য পৃথক আড়ম্বর না করে দুটি সম্প্রতি প্রকাশিত মূল্যবান প্রবন্ধের উল্লেখ করছি। এ বছরের শারদীয় সংখ্যা নতুন সাহিত্যে রণজিৎ দাশগুপ্তের কলিকাতা মহানগরীর সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের কয়েকটি দিক,—প্রবন্ধটি প্রথম মন্তব্য প্রসঙ্গে, এবং উক্ত সংখ্যা চতুষ্কোণে অশোক রুদ্রের মার্কসবাদীর আত্মজিজ্ঞাসা প্রবন্ধটি দ্বিতীয় মন্তব্য প্রসঙ্গে প্রচুর আলোকসম্পাতী প্রবন্ধ। তথ্যে পরিসংখ্যানে এবং ব্যাখ্যায় প্রবন্ধ দুটি আজকের জীবনের নাগরিক ব্যর্থতার স্বরূপ দেখিয়ে দিয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে যে কথা মার্কসবাদীদের অধিকতর প্রণিধানযোগ্য সেটা হল এই—শ্রমিক আন্দোলন এখনো মধ্যবিত্ত নেতৃত্বাশ্রয়ী বলেই এখনো আন্দোলনের কোনো প্রবল জাহ্নবীধারা গড়ে ওঠেনি। বামপন্থী লেখকমানসে এদিক থেকে কোনো সম্বল নেই। যা আছে তা ইতঃস্তত কয়েকটি অগ্নিগর্ভ বিক্ষোভের স্মৃতিমাত্র। এর প্রেরণা বেশিদূর নয়। তার থেকে অনেক বেশি প্রবলাকারে সচেতন শিল্পীমানসে অনুভূত হয়েছে জীবনের ভগ্নাংশিক বিক্ষিপ্ততা যার প্রামাণিক স্বরূপ উক্ত প্রবন্ধ দুটিতে ধৃত। কাটামুণ্ড-চেহারায় জীবনের যথার্থ বাস্তব অধ্যয়ন সম্ভব কিনা এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে নরকের প্রহরীর লেখক পূর্ব অনুচ্ছেদে কথিত সঙ্কটের চেহারা আঁকিতে গিয়ে চর্যাপদের হরিণী লেখেন। যে ভাঙা আয়নায় ভুতো মুখ দেখত এবং ক্রুদ্ধ হত, সুধাময়ের স্বগত অবগাহনে সেই ভাঙা দর্পণেরই অন্বার্থ। তাই সুধাময়েরও মনে পড়ে যায় অনিবার্যভাবে কাটামুণ্ডের প্রতীক। শুধু অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ তাড়নায় ভুতো যেখানে অশ্রুময়তায় স্পষ্ট—সুধাময় সেখানে নিজেই সেই ভাঙা দর্পণ বলে গল্পের ঋজুতা পরিহৃত হয়েছে। দর্পণ এবং প্রতিবিম্ব উভয়ই পরস্পর সাপেক্ষ এই বোধ নিয়ে দীপেনবাবু অগ্রসর হয়েছেন বিমূঢ়, বেপথু,

ইতিনেতির কাটাকুটিতে জটিল বাস্তবের সমগ্রতাকে রূপায়িত করার জন্য। সুধাময় উকিলুদ্দি কি কফিলুদ্দি (ভাসান) নয়। কলকাতার প্রতিদিনও তরঙ্গসঙ্কুল মেঘনা নয়। বরঞ্চ চতুর্দিকবর্তী মন্থর ক্লান্তিতে সুধাময়েরাও এখানে অকিঞ্চিৎকর। তাই সময়-সচেতন সুধাময়দের চিন্তায় নিজেকেই ব্যঙ্গ করার প্রবণতা। এই ব্যঙ্গের দৌলতেই গল্পটিতে যা কিছু রক্তসঞ্চার হয়েছে। নতুবা গল্পটি একটি বিশেষ দুর্বলতার দুর্ভোগ বহন করছে। সে দুর্বলতা হল বস্তু-সম্পর্ক-শূন্যতা। দীপেনবাবুই পরবর্তী কয়েকটি গল্পের সার্থকতার মূলে দৃঢ় বস্তুভিত্তি। জটায়ু, স্বয়ম্বর সভা তার প্রমাণ। এই বস্তুভিত্তিকতার গুণেই সেখানে গাল্পিক সার্থকতা নূতন আস্বাদ বিতরণে সক্ষম হয়েছে। চর্যাপদের হরিণী গল্পের চূড়ান্ত দৌর্বল্য এইখানে যে সুধাময় চিন্তার সাহায্যে যে আত্মপরিচয় ব্যক্ত করতে চেয়েছে তা বাস্তব-ভূমির দ্বারা সমর্থিত হয়নি। এই ত্রুটির জন্যই যে প্রতীক নির্বাচিত করা হয়েছে তা গল্পের প্রসঙ্গ-প্রকরণের প্রয়োজনে স্বভাবজ নয়। বরঞ্চ মনে হয় আরোপিত। চর্যাপদের হরিণ-হরিণী লোক ব্যবহারে প্রসিদ্ধ প্রতীক না হওয়ায় লেখক নিজেই প্রতীক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গল্পের সাবলীলতার ধারাতেও ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন। অবশ্য এখানে একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়—এই গল্পটির তাৎপর্য গল্পটির নিজস্ব ব্যর্থতাতেও হারায় না। এবং এই একটি গল্পের সার্থকতায় ও ব্যর্থতায় নব নিরীক্ষার সার্থকতা অসার্থকতার কিছু প্রমাণিতও হয় না।

গল্প গ্রন্থটির সার্থকতম গল্প ভাসান এবং নরকের প্রহরী। মানুষের যন্ত্রণাকে দীপেনবাবু মানুষ হিসাবেই অনুধাবন করতে চান। এখানে তিনি কোনো ব্যাখ্যাসূত্রের ধার ধারেন না। গভীর পর্যবেক্ষণ ও শান্ত সহানুভূতির আলোকে তিনি যখন মানুষের যন্ত্রণাময় জীবনের পাতাগুলি একে একে খুলতে থাকেন তখন তাঁর শক্তির বিশিষ্টতা স্বতঃস্বীকার্য। একটা মেলায় ছুটো সার্কাসের কতকগুলি মানুষকে নিয়ে তিনি যে গল্প (নরকের প্রহরীতে) গড়ে তুলেছেন তা শুধুমাত্র গরীব মানুষের দুর্দশার গল্প নয়—তার রসসিদ্ধিতে অজানিতে সৃজিত হয়েছে আধুনিক জীবনের রূপক। ফেণিলোচ্ছল মুহূর্ত-সর্বস্ব জীবনের বিকার, কাটামুণ্ডুর খণ্ডিত জীবনের যন্ত্রণাকে দেখেও চিনতে পারে না—সে বাবা বলে উপহাস করে। এখানে বেদনার চূড়ান্বিত মুহূর্ত সৃজনে তিনি সিদ্ধকাম। কিন্তু এই সিদ্ধিতেই তিনি থেমে থাকেন নি। এবং এইখানে বলা যেতে পারে দীপেন-বাবুর লেখক-সততা। তিনি যেমন ভাসানের সাফল্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েননি

তার পরে ঘাম লিখেছেন, তেমনি নরকের প্রহরীর সাফল্যেও আবিষ্ট না হয়ে তিনি বাস্তবকে নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করার ব্যাপারে অনলস থেকেছেন। লিখেছেন চণ্ডীপদের হরিণী। যে নির্বস্তুকতার জন্য গল্পটি ব্যর্থ হয়েছে সেই শূন্যতা পূরণের জন্য তিনি প্রয়াসশীল—সে নিদর্শনও অবিদ্যমান নয়। বাস্তবকে নানা দিক থেকে একজন লেখক ধরবার চেষ্টা করেন। যখন তিনি শক্ত মুঠোয় তাকে ধরতে পারেন তখন তাঁর প্রসঙ্গ প্রকরণ সবই সার্থক। দীপেনবাবু নিজের সাফল্য এবং ব্যর্থতা থেকেই সে শিক্ষা গ্রহণ করছেন ও করবেন বলে আমার বিশ্বাস।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃতি সংবাদ

বিয়োগপঞ্জী

মনীষী ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ও প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নায়কত্ব বাংলাদেশে যে বিরল সংখ্যক মনস্বীর জীবনে, কর্মে যুক্তি এবং মননশীলতার যথার্থ বিকাশ সম্ভব করেছিল, ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন তাঁদেরও মধ্যে বিশিষ্ট। এই বৈশিষ্ট্য অর্জনের মূলে ছিল তাঁর চরিত্র। সমাজতত্ত্বের প্রতি সহজাত আকর্ষণ বশে ও মার্কসবা'দের অধ্যবসায়ী ছাত্ররূপে ধূর্জটিপ্রসাদ 'সবুজপত্র'গোষ্ঠীর মধ্যেও স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত ছিলেন। সেই একই কারণে পরবর্তীকালে 'পরিচয়' পত্রিকার আসরেও তিনি ছিলেন স্তম্ভবিশেষ। সুধীন দত্তের সম্পাদনাভার ত্যাগের পরও 'পরিচয়' কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছিল তাঁর প্রীতি, সহযোগিতা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক।

তাঁর বিশাল ও কর্মময় জীবনের অধিকাংশই কেটেছে উত্তর প্রদেশে সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতির অধ্যাপক রূপে। অধ্যাপনাসূত্রে ছাত্রসমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল প্রত্যক্ষ আর ঘনিষ্ঠ। শিক্ষক হিসেবে তাঁর সাফল্য প্রায় প্রবাদে পরিণত। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ আলি পার্কে অনুষ্ঠিত ছাত্রফেডারেশানের সম্মেলনে ধূর্জটিপ্রসাদের বিখ্যাত বুদ্ধিদীপ্ত ভাষণে প্রগতিশীল ছাত্রসমাজের প্রতি তাঁর অপরিসীম মমতার পরিচয় আজও অনেকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। কর্মব্যপদেশে তাঁকে কয়েকবারই বাইরে যেতে হয়েছে। ব্রুসেলসে আন্তর্জাতিক সমাজ-তাত্ত্বিক এ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশন, মস্কোয় আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কংগ্রেস, প্যারিসে ইউনেস্কো সেমিনার, বান্দুং সম্মেলন প্রভৃতি বিবিধ আন্তর্জাতিক অধিবেশনে তাঁকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হয়েছে। হল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ভিজিটিং প্রফেসর রূপে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি কিছুকাল অধ্যাপনা করেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন প্রকৃত বৈদগ্ধ্য ও যথার্থ রসগ্রাহীর মূর্ত রূপ। সংস্কার এবং ভাবালুতার বিরুদ্ধে যুক্তি আর মননের শাণিত অস্ত্র প্রয়োগে চিরদিনই তিনি

অকুণ্ঠ ছিলেন। বাংলাদেশের ভাবরাজ্যে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তনায় তাঁর অবদান সামান্য নয়। উদার প্রগতিশীল একটি জীবনদর্শনের আলোয় জগৎ ও জীবনকে দেখার বাসনায় বহুবারই তিনি অনেকের বিরাগভাজন হয়েছেন। আবার তথাকথিত সহজ-সরল-জনপ্রিয় প্রগতিশীলতার চোরাবালিতে পা দিতেও তাঁর অনীহা ছিল। তাই কল্লোলযুগের বহু ঢক্কানিনাদিত 'বস্তী-সাহিত্যে'র মারাত্মক কতকগুলি ভানকে তিনিই নির্মম সমালোচনা করতে পেরেছিলেন। অবশ্য ধূর্জটিপ্রসাদও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর সময় ও পরিবেশগত প্রভাবে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জাগতিক সমস্ত ব্যাপারেই কৌতুহল বজায় রেখে যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যয়ের সাধনায় মূলত তিনি বিকাশশীল মানবসভ্যতার পক্ষেই তাঁর সমর্থন ঘোষণা করে গেছেন।

সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ে ধূর্জটিপ্রসাদের ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে একত্রে একটি গ্রন্থ রচনা করে ধূর্জটিপ্রসাদকে দুর্লভ সম্মানের অধিকারী করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের ছবি, রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রভৃতি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে বহুপূর্বে রচিত নিবন্ধাবলী আজও মৌলিক, আজও পথনির্দেশক। 'টেগোর : এ স্টাডি' পুস্তিকাটি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অন্যতম আকর-গ্রন্থ। তাছাড়া সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বহুবিধ প্রবন্ধাবলী বিষয়ের গুরুত্বে, বক্তব্যের ব্যঞ্জনায়, স্টাইলে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের গৌরব বিশেষ।

বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর, প্রমথ চৌধুরী, অতুল গুপ্ত প্রমুখ অনেকানেক মনস্বীর সঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদও প্রবন্ধকার হিসেবে, তাঁর বিশেষ কালগত ভূমিকার জন্য আমাদের দেশের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তির অধিকারী।

এমনই আর-এক কীর্তি তাঁর 'অন্তঃশীলা'-'আবর্ত'-'মোহনা' উপন্যাসত্রয়ী। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের উত্তরাধিকার রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত দ্বিতীয় যে কথাসাহিত্যিক সেদিন বাংলাসাহিত্যে স্বীকার করেছিলেন, তিনি ধূর্জটিপ্রসাদ। সেই প্রবল শরৎচন্দ্রীয় তথা কল্লোলীয় ভাবালুতার দিনে উপন্যাসের নতুন সংজ্ঞা উপলব্ধিতে ধূর্জটিপ্রসাদই বাংলাদেশকে বাধ্য করেছেন। বিষয়ে, বিন্যাসে, ভাষা ব্যবহারে, সমস্যার উপস্থাপনায়, এক কথায় উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্যে ধূর্জটিপ্রসাদ যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন—আজও তা সাধারণভাবে স্বীকৃত হয় নি। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ এবং অবজ্ঞাত হলেও রবীন্দ্রনাথ ও ধূর্জটিপ্রসাদের হাতে যে নতুন কথাসাহিত্যের আন্দোলন জন্মগ্রহণ করল—তা পরবর্তীকালেও নানা বিচি

গতির মধ্য দিয়ে বিকাশমান। উপন্যাসত্রয়ীর নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাই ধূর্জটিপ্রসাদ আমাদের অশেষ ঋণে আবদ্ধ করে গেছেন।

সম্বর্ধনা

বীর এসেছিলেন, ইউরি গাগারিন। কলকাতা প্রস্তুত ছিল। আর ময়দানের সমাবেশে প্রত্যক্ষ করলাম মাটির সঙ্গে মহাকাশের যোগ। মহাজাতি সদনে ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির প্রীতি অনুষ্ঠানে অধ্যাপক সত্যেন বসু বললেন "রূপ আর মানুষ" এক হয়ে গেছে।

এক হয়ে যাচ্ছে। দেশ আর দেশের ভৌগোলিক ব্যবধান ঘুচেছে। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে মানুষের দুর্জয় পাদস্পর্শ নিছক কল্পনা থাকছে না। অতীতের রূপকথা ভবিষ্যতের বাস্তবতার সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছে। ইউরি গাগারিন সভ্যতার অমোঘ বিজয়বার্তা এবং বিশ্বমানবসংহতির বাণী দেশে দেশান্তরে বহন করে বেড়াচ্ছেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির মানপত্রে বলা হয়েছে "আজ পৃথিবীর একদল পরাভববাদী হাহাকার করছেন, বিশ্বের ধ্বংস আসন্ন—মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতায় সমগ্র মানবতা অনিবার্য বিনাশের পথে অগ্রসর। কিন্তু আপনার স্বদেশবাসী বৈজ্ঞানিকদের কল্পনাতীত সাফল্যে আপনি এবং আপনার মিত্র মেজর গেরম্যান তিতভের সার্থক মহাশূন্যবিজয়ে এ আশংকা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রথম মহাকাশযাত্রীরূপে সমগ্র প্রাকৃতিক বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করবার গৌরবে এই সত্যই আপনি প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, মানবতা আজ আত্ম-ধ্বংস চায় না—দূরদূরান্তে গ্রহেগ্রহে বিপুলতম আত্মবিস্তার ও বিকাশের পথে সে অগ্রসর। ৎসিঅলকোভস্কির গাণিতিক দিব্যদৃষ্টি আজ বিশ্বমানবের প্রত্যক্ষ সত্য। এই নূতন ইতিহাস রচনার পথে প্রথম পদচিহ্ন আপনিই অংকিত করেছেন। মানুষের চিরসঞ্চিত স্বপ্ন ও সাধনা রূপায়িত হয়েছে…।"

নাট্যপ্রসঙ্গ

…শে নভেম্বর গেরোসিম লেবেদফ দিবস উপলক্ষে লিটল্ থিয়েটার গ্রুপ মিনার্ভা …কে এক সময়োপযোগী আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিলেন। বাংলাদেশে

নবনাট্য আন্দোলন নতুন চলচ্চিত্রের আন্দোলনের মতোই ক্রমশ এক ঘটনা হয়ে উঠছে। কিন্তু এই আন্দোলন সম্পর্কে জীবনবিমুখতা, ঐতিহ্যহীনতা ও আঙ্গিক সর্বস্বতার অভিযোগ এরই মধ্যে উঠেছে। এই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের পক্ষে দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপক্ষে উৎপল দত্ত মুখ্য আলোচক ছিলেন। নবনাট্য আন্দোলন ও দর্শক সমাজ এই আলোচনা থেকে প্রভূত উপকৃত হবেন সন্দেহ নেই।

শুধু নাট্যপরিবেষণ নয়, দর্শকদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন তথা দর্শক রুচি গড়ে তোলার পেছনে লিটল্ থিয়েটার গ্রুপের এ জাতীয় প্রয়াস অকুণ্ঠ অভিনন্দনযোগ্য। নবনাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে ক্রমশই তাঁরা এক গৌরবময় ভূমিকার অধিকারী হচ্ছেন।

এই প্রসঙ্গে 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠীর কথা মনে পড়ে। এই দলটির কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা। বাংলা দেশের গণনাট্য আন্দোলন ও সাম্প্রতিক নবনাট্য আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বে এঁদের ব্যক্তিক ও গোষ্ঠীগত ভূমিকাও স্মরণ করি। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে 'বহুরূপী' জীবিত থেকেও যেন নেই। শম্ভু মিত্র মহাশয় ভিন্নধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণ করে, তৃপ্তি মিত্র পেশাদারী নাটকে অভিনয় করে এবং 'বহুরূপী'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু গুণী ব্যক্তি একে একে দল ছেড়ে হয়তো এই নাট্যপ্রতিষ্ঠানটিকে দুর্বল করে ফেলেছেন। ক্বচিৎ দু-একটি অভিনয়, তাও পুরনো নাটকের অভিনয় মারফৎ মাঝে মাঝে নিউ এম্পায়ার হলে 'বহুরূপী' নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। ছোট-বড় বিভিন্ন সম্প্রদায় তাঁদের আদর্শ ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিপুল আবেগে যখন দেশে এক নবনাট্য আন্দোলনে ক্রম অগ্রসরমান, তখন 'বহুরূপী'র প্রয়াসও সেই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবে, আমরা সেই আশা রাখি। কারণ প্রথমাবধি যত সীমাবদ্ধতাই থাক, 'বহুরূপী' ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা যদি এই আন্দোলনের সহযাত্রী হন তাহলে এই আন্দোলন নিঃসন্দেহে অনেক শক্তিশালী হবে।

খুবই আনন্দের বিষয় যে দীর্ঘদিন বাদে আবার এই সম্প্রদায় সম্প্রতি একটি নতুন নাটক, 'বিসর্জন', মঞ্চস্থ করেছেন। 'পরিচয়' 'বহুরূপী'র পুরনো বন্ধু। তাই 'বহুরূপী'র প্রতিটি উদ্যোগ আমরা সাগ্রহে লক্ষ্য করি। 'বিসর্জন' দেখার সুযোগ আমরা এখনও অর্জন করি নি। তাই সে সম্পর্কে কোনো আলোচনা সম্ভব হল না। আমরা ভরসা রাখি 'মুক্তধারা'র মতো এই নাটকটি 'কাঞ্চনরঙ্গ'র বন্যায় তলিয়ে যাবে না। বরং 'বিসর্জন' 'বহুরূপী'র জীবনে

নতুন প্রতিষ্ঠা এনে দেবে। বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা রূপে এঁরা সর্বতোমুখী প্রচেষ্টায় নবনাট্য আন্দোলনকে, নিজেদেরও অগ্রসর করতে তৎপর হবেন।

এই ক্রমবর্ধমান নবনাট্য আন্দোলনে 'শৌভনিক' সম্প্রদায়ের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে যাত্রার ঐতিহ্য অদ্যাবধি জীবন্ত। তদুপরি নাট্যগোষ্ঠী ও দর্শক সমাজ উভয়েরই আর্থিক অবস্থা খানিকটা 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের গণতন্ত্রীয়', অর্থাৎ সংকটাপন্ন। এই বাস্তব কারণগুলির সম্মুখীন হয়েই 'শৌভনিক' এ দেশে মুক্তাঙ্গন রীতিতে নাট্যপ্রদর্শনের এক বলিষ্ঠ আন্দোলন শুরু করেছেন। ১২৩, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোডে পরীক্ষামূলক ভাবে তাঁরা একটি 'মুক্ত অঙ্গন' ও বেশ কিছুদিন হল পরিচালনা করছেন। শুধু 'শৌভনিক' নয়, বহু নাট্য প্রতিষ্ঠানই নামমাত্র চাঁদার বিনিময়ে এই মঞ্চ ব্যবহার করতে পারেন। আমাদের দেশে জাতীয় থিয়েটার কবে প্রতিষ্ঠিত হবে জানি না। কিন্তু এই 'মুক্তাঙ্গন' মঞ্চ, সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত মিনার্ভা থিয়েটার প্রভৃতিই সে অভাব আজ খানিকটা পূরণ করতে পারছে। সৎ উদ্যোগ যে কোনো প্রতিকূলতাই সহ্য করে না; শিল্পী তাঁর সৃষ্টি নিয়ে, দেশবাসী তাঁদের সাংস্কৃতিক আগ্রহ নিয়ে যে নিজেরাই অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারেন এই ঘটনাগুলিই তার প্রমাণ।

তাছাড়া এই মুক্তাঙ্গন রীতির প্রভাবে আমাদের যাত্রা ও থিয়েটার যে অনেকখানিই পুনর্গঠিত হতে পারে—তারও সম্ভাবনা অস্বীকার করি না।

শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক'; গোর্কীর 'মা'; ইবসেনের 'গোষ্টস্'; রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'মুক্তির উপায়', 'রাজা ও রাণী', 'বাঁশরী' প্রভৃতি নাটক 'শৌভনিক' সম্প্রদায় এই মুক্তাঙ্গন রীতিতেই মঞ্চস্থ করেছেন। নাটক নির্বাচনেই এই গোষ্ঠীর বৈদগ্ধ্য ও সমাজ সচেতনতার যথার্থ পরিচয় পাই। 'মৃচ্ছকটিক', 'মা' ও 'গোরা' যারা পর্যায়ক্রমে অভিনয় করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্য ও ভূমিকা সম্পর্কে নতুন কিছুই বলার অপেক্ষা রাখে না। 'দ্বিতীয় মহীপাল', 'মা-হিংসী', 'ফানুষ' প্রভৃতি নতুন নাটকও এঁরা মঞ্চস্থ করেছেন!

গেরোসিম লেবেদফ ও মুক্ত অঙ্গন প্রতিষ্ঠা দিবসের স্মরণে ২৭শে নভেম্বর 'শৌভনিক' সম্প্রদায় তাঁদের মঞ্চে এক সাংস্কৃতিক সম্মেলনীর আয়োজন করেছিলেন। নতুন নাটক 'ল'ন'না'-'র কয়েকটি নির্বাচিত দৃশ্য এইদিন অভিনীত হয়েছে। ৯ই ডিসেম্বর থেকে নাটকটির সম্পূর্ণ প্রদর্শন শুরু হবে।

পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসব

নবগঠিত সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসবের মাধ্যমে কয়েকটি অসামান্য চলচ্চিত্রের সঙ্গে তাঁরা পরিচয় লাভের সুযোগ করে দিয়েছেন। বাংলা দেশে এ যাবৎ যতগুলি চলচ্চিত্র-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে, গুণগত বিচারে এটি নিঃসন্দেহে তাদের অন্যতম প্রধান বলে বিবেচিত হবে। উৎসবের বাইরে 'এ্যাশেজ এ্যাণ্ড ডায়ামণ্ডস'-এর অতিরিক্ত ছুটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে উদ্যোক্তারা বিরল সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন।

সম্প্রতি তরুণ পরিচালক আঁদ্রে মুঙ্কের জীবনাবসান হয়েছে। শেষ দিনে তাঁর 'ব্যাড লাক' প্রদর্শিত হল। এই অসাধারণ চলচ্চিত্রটির পরিচালক মুঙ্কের অকাল জীবনাবসানে আমরা আত্মীয় বিয়োগের বেদনা অনুভব করেছি। প্রসঙ্গত বলা দরকার আইজেনস্টাইনের সহযোগী প্রখ্যাত ক্যামেরাম্যান এডুয়ার্দ টিসে-রও সম্প্রতি মৃত্যু হয়েছে। রুশ চলচ্চিত্রের স্তম্ভবিশেষ এডুয়ার্দ টিসেকে বাদ দিয়ে আইজেনস্টাইনের কোনো চলচ্চিত্রের কথাই যেন ভাবা যায় না। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছি।

পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসবে মোট পাঁচটি পূর্ণ দৈর্ঘের ছবি ও কয়েকটি শর্ট দেখানো হয়েছে। কার্টুন, ডকুমেণ্টারি ইত্যাদি শর্টসিরিজে কয়েকটি ছিল নিরীক্ষামূলক।

আঁদ্রে ওয়াজদার 'এ্যাশেজ এ্যাণ্ড ডায়ামণ্ডস' এই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল। ওয়াজদার 'কানাল' আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-জগতে ওয়াজদা, মুঙ্ক প্রভৃতি তরুণ পরিচালক 'পোলিশ স্কুল' নামে এক স্বতন্ত্র স্কুল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। 'এ্যাশেজ এ্যাণ্ড ডায়ামণ্ডস্'কে বলা হয় 'পোলিশ পটেমকিন'।

আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত অল্পপরিচিত এই 'পোলিশ স্কুল' চলচ্চিত্রের আন্দোলনে কি অসামান্য সিদ্ধিলাভ করেছেন প্রদর্শিত প্রতিটি ছবিই তার প্রমাণ। অবশ্য 'আওয়ার্স অব হোপ' ও 'এ্যাটেনশন' আমি দেখি নি।

সমাজতান্ত্রিক দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে এদেশে কত ভুল, মিথ্যে ধারণা প্রচারিত হয় তার উদাহরণ এই ছবিগুলি। বাস্তবতার কি গভীর ও ব্যাপক তাৎপর্য অন্বেষণে এঁরা নিয়ত নিরীক্ষাশীল তারও প্রমাণ বিশেষত ওয়াজদা ও মুঙ্কের ৩টি ছবি। আর 'নাইট ট্রেন' এবং 'ইভ ওয়াণ্টস্ টু স্লীপ'ও অন্য কারণে তাৎপর্যপূর্ণ।

আমাদের দেশে এই উৎসবে প্রদর্শিত ছবিগুলির সম্পর্কে ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। আমাদের নবজাত ও গৌরবময় চলচ্চিত্রের আন্দোলনেও অনিবার্যভাবেই বাস্তবতা, আঙ্গিক, দর্শকরুচি প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক সমস্যা এসেছে। অত্যধিক সরলীকরণের প্রভাব দেখেছি 'তিন কন্যা'য়, ও আঙ্গিকসর্বস্বতার ফল প্রত্যক্ষ করেছি 'কোমল গান্ধার'-এ। অথচ সময় ও সমাজের প্রতি অনুগত থেকে, আঙ্গিক বিষয়ে চূড়ান্ত আধিপত্য অর্জন করে, জীবনের মৌলিক সমস্যা ও সর্বব্যাপী রূপকে ফুটিয়ে তোলার পারদর্শিতা আবার এই তরুণ পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে দেখা গেল। আমাদের দেশেও সত্যজিৎ রায় এবং ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন প্রমুখ তাঁদের সম্পর্কে আমাদেয় শ্রদ্ধান্বিত হতে বাধ্য করেছেন। আশা করব এঁদেরই কেউ বা যোগ্য কোনো ব্যক্তি অচিরে বিশেষত 'এ্যাশেজ এ্যাণ্ড ডায়ামণ্ডস' ও 'ব্যাড লাক' সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করবেন।

প্রদর্শনী

সম্প্রতি কলকাতায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্মের প্রদর্শনী হয়ে গেল। ১১ থেকে ১৯শে নভেম্বর ক্যাথিড্রাল রোডের আকাদেমী ভবনে অনুষ্ঠিত শ্রীমতী অর্জুন রায়ের প্রদর্শনীটি ছিল সত্যিই বিশিষ্ট ও তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের চারিপাশে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট যে অনুপম শিল্পসম্ভার ছড়িয়ে আছে, শ্রীমতী রায়ের শিল্পী চোখ তা আবিষ্কার করেছে ও স্রষ্টার হাতের সামান্য স্পর্শে সেই স্বভাবজাত শিল্পকর্মই হয়েছে এই প্রদর্শনীর সম্পদ। গাছের ডাল, কাঠের টুকরো বিভিন্ন অনুষঙ্গ নিয়ে দর্শকের সামনে এক জগৎ উদ্‌ঘাটিত করেছে।

সমকালীন শিল্পীসংঘ কয়েকজন সাম্প্রতিক শিল্পী প্রতিষ্ঠিত এক উল্লেখযোগ্য শিল্পসংস্থা। ৩০শে অক্টোবর থেকে ৮ই নভেম্বর পর্যন্ত আকাদেমি ভবনে এঁদের প্রতিনিধিত্বমূলক শিল্পকর্মের দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনী হয়ে গেল। চিত্রকর্ম ছাড়া ভাস্কর্যের কয়েকটি নিদর্শনও ছিল। সোমনাথ হোড় প্রমুখ স্বপ্রতিষ্ঠ শিল্পী ব্যতীত অপেক্ষাকৃত নবাগত কয়েকজন শিল্পীর কাজও এই প্রদর্শনীর সম্পদ।

অজয় মুখোপাধ্যায় তরুণ শিল্পী। আকাদেমি ভবনে ৯ থেকে ১৫ই নভেম্বর এঁর চিত্রের একটি একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। অধিকাংশ সাম্প্রতিক শিল্পীর মতোই অজয় মুখোপাধ্যায়ও চিত্রকলার বিষয় ও প্রকরণের প্রাসঙ্গিক সমস্যায় আক্রান্ত এবং তা থেকে উত্তরণের প্রয়াসও তাঁর আছে।

১লা থেকে ৭ই নভেম্বর আমাদেমি ভবনে প্রখ্যাত শিল্পী তুফান রাফাইয়ের

চিত্রকর্মের একটি উপভোগ্য একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাফাইয়ের প্রদর্শনীটি বহু আলোচিত এবং বিতর্কিত একথা 'পরিচয়' পাঠকদের অজানা নয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে

৩রা ডিসেম্বর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকী।

এই রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে তিনি অনুপস্থিত। মহাকাশ-বিজয়ী ইউরি গাগারিন মানবসভ্যতার বিপুল অগ্রগতি, বিশ্বমৈত্রী ও দৃপ্ত শান্তির বার্তা বহন করে যখন কলকাতার বুকে এসে দাঁড়ালেন, তখনও তিনি ছিলেন না। কলকাতার উপকণ্ঠে হিন্দ মোটর কারখানার শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপর বর্বর পুলিশী হামলা, স্টেশন ও পার্শ্ববর্তী বিস্তৃত অঞ্চলে মালিকপক্ষ এবং সরকারের যৌথ প্রয়াসে মধ্যযুগীয় অন্ধকার—আর মানুষ বাঁচার জন্য রুখে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু সেখানেও তিনি থাকতে পারেন নি।

তাই বারবার আজ মানিকবাবুকেই মনে পড়ছে। একদিকে সভ্যতার নিশ্চিত অগ্রগতি, অন্যদিকে অবক্ষয়ী পশুশক্তির শেষ আস্ফালন—বিকাশ আর বিনাশের এই দুই পরস্পরবিরোধিতার সামনে দাঁড়িয়ে আজ বারবার তাঁর কথাই মনে পড়ে।

দেশবাসী মানিকবাবুকে শ্রদ্ধা করেন, চোখের মণির মতো তাঁরা এই মহৎ মানুষ ও গুণী শিল্পীর স্মৃতিকে রক্ষা করছেন। কিন্তু সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি-কর্মীরা কি তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন ?

কলকাতার উপকণ্ঠে কয়েক হাজার মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। মানুষের জীবন, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ যেখানে সংকটাপন্ন, সেখানে সমাজ ও সভ্যতার ধাত্রীপুরুষ সাহিত্যিককুল নীরব থাকেন কি করে ?

সৎ, বিবেকবান সাহিত্যিকদের কাছে তাই আমাদের আবেদন—আসুন আমরা দল বেঁধে সেই নিপীড়িত শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াই। আসুন আমরা বলি—ভালোবাসি, ঘৃণা করি। কাল্পনিক বা দূরবর্তী বিপদের আশঙ্কায় ঘরে মুখ না লুকিয়ে আসুন বাংলা-দেশের লেখক ও শিল্পীরা একত্রে আবার মানুষের পাশে দাঁড়াই।

আজ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নেই। কিন্তু বাংলাভাষায় ছোটো বকুলপুরের যাত্রী কি আর লেখা হবে না ?

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পথ-নাটিকা 'স্পেশাল ট্রেন'

মিছিল ও ধর্মঘটের শহর কলকাতায় গত ৬ই ডিসেম্বর তারিখে নতুনতর ইতিহাস রচিত হয়েছে। এই দিনটি ছিল 'হিন্দ মোটরস দিবস'। বি-পি-টি-ইউ-সির আহ্বানে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকরা এই দিনটিতে সভা শোভাযাত্রা ও অর্থসংগ্রহ ইত্যাদির মাধ্যমে হিন্দ মোটরস্-এর ধর্মঘটী শ্রমিকদের প্রতি সমর্থন ও একাত্মতা জানিয়েছিলেন। যদি শুধু এইটুকুই হত তবে তা কলকাতার পক্ষে নতুন কোনো ব্যাপার হত না। কলকাতার সংগ্রামী ঐতিহ্যে এ-ধরনের বহু দিবসই রক্তের অক্ষরে চিহ্নিত। কিন্তু গত ৬ই ডিসেম্বর তারিখটি আরো একটি অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। কীর্তিমান নট উৎপল দত্ত ও তাঁর সহকর্মীরা এইদিন হিন্দ মোটরস্-এর শ্রমিকদের সংগ্রামকে উপজীব্য করে একটি পথ-নাটিকার অভিনয় করেছেন।

নাটিকাটির নাম 'স্পেশাল ট্রেন'। সরাসরি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিনা মঞ্চে, বিনা আলোকসম্পাতে, বিনা মেক্-আপে, বিনা আবহসঙ্গীতে প্রায় আধঘণ্টাব্যাপী অভিনয়। যান্ত্রিক সহায়তা নেওয়া হয়েছে শুধু একটি লাউডস্পীকারের। তাও পুলিশের আপত্তিতে ডালহৌসি স্কোয়ারের অনুষ্ঠানে এই যান্ত্রিক সহায়তাটুকুও পাওয়া যায় নি। এমন অনাড়ম্বরভাবে, এমন রাস্তার ওপরে জনতার ঠিক মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে সত্যিকারের একটি নাটিকার অভিনয় যে সম্ভব তা নিজের চোখে না দেখলে আর নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস করা শক্ত।

অভিনয় বললাম বটে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, অভিনয় বলে মনেই হয় নি। বাস্তব ঘটনাগুলোই যেন চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। অথচ, যাকে বলা হয় নাটকের 'অ্যাক্শন', তার বিশেষ সুযোগ এই পথ-নাটিকায় ছিল না। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে স্বল্প পরিসরের মধ্যে প্রধানত কথোপকথনের মাধ্যমে এই নাটকের বিস্তার। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা ছিল যে নাটক শেষপর্যন্ত না ময়দানের বক্তৃতার চেহারা নেয়। কিন্তু নাটক শেষ হবার পরে অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম যে আমরা আর শুধুমাত্র শ্রোতা নই, হিন্দ মোটরস্ শ্রমিকদের লড়াইয়ে আমরাও সামিল হয়েছি, সাতান্ন দিনের অকম্প্র ধর্মঘটের গৌরবে আমরাও গৌরবান্বিত। কলকাতার রাস্তাই কিছুক্ষণের জন্যে হয়ে উঠেছিল হিন্দ মোটরস্-এর লড়াইয়ের ময়দান। সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা ব্যঙ্গবিদ্রূপে দীপ্ত হয়েছি, উত্তেজনায় অস্থির, আবেগে টলোমলো, প্রতিজ্ঞায় কঠোর। তারই মধ্যে কেউ একজন ঝুলি হাতে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আর

আমরা পকেট খালি করে সমস্ত পয়সা সেই ঝুলির মধ্যে ফেলেছি। আমি তারপরেও শান্ত হতে পারি নি। ধর্মঘটী শ্রমিকের গলায় গলা মিলিয়ে শ্লোগান তুলেছি—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

খুব সম্ভবত এমনটিই হয়ে থাকে। উপলক্ষটি ছিল আমাদের কাছে খুবই বাস্তব। আর নাটকের চরিত্রগুলো আমাদের কাছে এতই পরিচিত ছিল যে তাদের মুখের একটি-দুটি কথা থেকেই আমরা অকথিত অনেক ইতিহাসকে উপলব্ধি করতে পারছিলাম। অর্থাৎ, জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগ ঘটতে পেরেছিল। তাই কিছুক্ষণের জন্যে ভুলতে পেরেছিলাম যে আমরা কলকাতার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী। কিছুক্ষণের জন্যে ভাবতে পেরেছিলাম যে হিন্দ মোটরস্ শ্রমিকদের লড়াই আমাদেরও লড়াই।

অথচ পরে ভেবে দেখেছি, উৎকর্ষের বিচারে এই নাটকটিকে সেরা নম্বর দেওয়া চলে না। দোষত্রুটি অনেক। খুঁটিয়ে বিচার করতে বসলে ফিরিস্তিটা খুবই দীর্ঘ হবে। কিন্তু সে-আলোচনায় এজন্যে যাব না যে আমরা যারা সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে হ্যাজাকের আলোয় নাটিকাটির অভিনয় দেখতে দেখতে কখন যেন নিজেরাই নাটিকার কুশীলব হয়ে উঠেছিলাম—সেই আমরাই হচ্ছি প্রমাণ যে খুব মোটা কথা খুব মোটা দাগে তুলে ধরতে পারলেও নাটকীয় সার্থকতা লাভ করা চলে। নাটকের উৎকর্ষ সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্কবিতর্ক ভাড়া-করা পেশাদারী মঞ্চের শৌখিন কেদারাটি না পেলে ঠিক যেন জাঁকিয়ে বসতে পায় না।

৬ই ডিসেম্বরের স্মরণীয় দিনটিতে কলকাতার পাঁচটি বিভিন্ন জায়গায় এই পথ-নাটিকার অভিনয় হয়েছিল। সকাল সাড়ে-সাতটায় গড়িয়াহাট মোড়ে, সাড়ে-আটটায় হাজরা মোড়ে, বিকেল সাড়ে-পাঁচটায় ডালহৌসি স্কোয়ারে, সন্ধে সাড়ে-ছটায় ময়দানের মনুমেন্টের নিচে, সাড়ে-সাতটায় শ্যাম স্কোয়ারে। সারা শহর জুড়ে যেন এক নতুন ধরনের উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছিল। শ্যামবাজারের অনুষ্ঠানটি হবার কথা ছিল পাঁচমাথার মোড়ে। কয়েক হাজার মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল সেখানে, যানবাহন বন্ধ হবার যোগাড়। শেষপর্যন্ত সবাই মিলে মস্ত একটি মিছিল করে হাজির হয়েছিল শ্যাম স্কোয়ারে। পথ-নাটিকা শুধু আর পথেই থাকে নি, ময়দানে ও স্কোয়ারেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

নাটিকাটি রচনা করেছেন উৎপল দত্ত। প্রধান একটি চরিত্রের অভিনেতাও তিনি ছিলেন। একটি কারখানার ধর্মঘটী শ্রমিকদের পক্ষ নিয়ে আমাদের দেশের

একজন সেরা নাট্যকার ও অভিনেতার এমন সচেতন আত্মনিয়োগের দৃষ্টান্ত কলকাতার মতো শহরেও বোধ হয় এই প্রথম। আর উৎপল দত্তর সঙ্গে তাঁর যে সব সহকর্মী যোগ দিয়াছিলেন তাঁদের কৃতিত্বও কিছুমাত্র কম নয়। সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন শেখর চট্টোপাধ্যায়, কমল মুখোপাধ্যায়, দেবেশ চক্রবর্তী, রমাবন্ধু চৌধুরী ও বিধান মুখোপাধ্যায়।

নাটকাটি শুরু হচ্ছে কারখানায় অবস্থানকরী পুলিশ ইন্‌সপেক্টর ও লেবর অফিসারের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে। তারই মধ্যে অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রের যাতায়াত। যেমন, একজন নিরীহ ট্রেনযাত্রী, একজন দালাল এবং সবার শেষে একজন ধর্মঘটী মজুর। চরিত্রগুলি বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শুধুই কথা বলেছে। কিন্তু যে কথা আগেই বলেছি, কথাগুলো কোনো সময়েই বক্তৃতার মতো শোনায় নি। হিন্দ মোটর ওয়ার্কস ও তার শ্রমিকদের ধর্মঘট —দুই দিকেই এমনভাবে আলোকপাত করা হয়েছে যে একদিকের শোষণ ও অপর দিকের সংগ্রাম সম্পূর্ণ একটি পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে উপস্থিত হতে পেরেছে। এই পথ-নাটিকাটির অসাধারণ সাফল্যও এই কারণেই।

ইলিয়া এরেনবুর্গের বিখ্যাত উপন্যাস ‘প্যারীর পতন’-এ সিয়েন কারখানায় ধর্মঘটের একটি ছবি আছে। এই ধর্মঘট চলার সময়ে কারখানার ভেতরে মঞ্চ খাড়া করে নাটকের অংশবিশেষ অভিনীত হয়েছিল। যে অভিনেত্রীটি শ্রমিকদের ডাকে বিশেষভাবে সাড়া দিয়েছিল তার নাম জেনেৎ। “নিষ্ফল বসন্ত থেকে কিছুটা অংশ সে অভিনয় করল। অভিনয়ের শেষে প্রশংসা আর অভিনন্দনের ঝড় উঠল যেন। হাততালির শব্দ ছাপিয়ে শোনা গেল অনেক মানুষের চিৎকার। জোনতের মনে হল, ফ্যাৎ অভেজুঁয়ার জনসাধারণ জেগে উঠেছে, এগিয়ে চলেছে জয়ের পথে—সে আর এখন সামান্য অভিনেত্রী জেনেৎ নয়, বীরনেত্রী আন্দালুসিয়া ডাক দিচ্ছে জনসাধারণকে।” উৎপল দত্তর স্পেশাল ট্রেনও এমনি এক সংগ্রামের ডাক, জয়ের ঘোষণা। আমরা তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আশা করছি, তাঁর প্রয়াস শিল্পের সঙ্গে জনসাধারণের সম্বন্ধকে ঘনিষ্ঠতর করবে এবং তাঁর দৃষ্টান্ত অন্যান্য শিল্পীদের দ্বারা অনুসৃত হবে।

অমল দাশগুপ্ত

গন্ধর্ব-র নবনাট্যোৎসব

তরুণ নাট্যগোষ্ঠী গন্ধর্ব-কে সাধুবাদ জানানো আগেই দরকার ছিল। যদিও নিছক সাধুবাদের জন্য নিশ্চয়ই এই দুঃসাহসিক নাট্যপ্রযোজনায় তাঁরা হাত দেন নি। গত ১৬ই এপ্রিল থেকে ১০ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ ছয়মাস ধরে গন্ধর্ব নাট্যসম্প্রদায় মিনার্ভা মঞ্চে বারোটি একাঙ্ক নাটক অভিনয় করলেন। নামকরা লেখকদের পেশাদারী নাটক নির্বাচনে এঁদের ঝোঁক ছিল না। তরুণ ও তরুণতরদের রচনাকেই গন্ধর্ব মঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে তুলে ধরেছিলেন। এবং এর কারণ, পরীক্ষামূলক নাট্যপ্রযোজনাতেই এঁদের আগ্রহ। গতানুগতিক অভিনয় কিংবা প্রযোজনা দুই ই এই সম্প্রদায়ের শিল্পীরা বর্জন করেছেন। নতুনতর জীবনবোধে অনুপ্রাণিত এই নাট্যসম্প্রদায়ের তরুণ শিল্পীরা কোনো গোঁড়া আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ নন। কিন্তু জীবনের প্রতি আনুগত্য এঁদের রয়েছে। এবং এই আনুগত্যই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাকে দিয়েছে সার্থকতা। নবনাট্য আন্দোলনের যে ধারা আজকের বাংলা নাটককে জীবনমুখী করেছে, গন্ধর্ব তারই উত্তরাধিকারী। জীবনের জটিল প্রশ্নের গ্রন্থি উন্মোচনের দায়িত্ব নিয়েছেন এযুগের সাহিত্যশিল্পী। নাটকের বক্তব্য ও আঙ্গিকেও তারই সৎ ও আন্তরিক প্রয়াস আমাদের আশান্বিত করে।

গন্ধর্ব সম্প্রদায়ের পক্ষে এই নাট্যোৎসবের প্রস্তাবনায় পূর্বগামীদের পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিয়ে বলা হয়েছিল : গন্ধর্বের 'নবনাট্য উৎসব' যে রুচিবৈচিত্র্য এবং সংস্কারবিহীন জীবনাভিমুখীনতার দাবি রাখছে, তা অন্যান্য নাট্যোৎসব থেকে বর্তমান উৎসবকে স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করবে। নাটক নির্বাচন সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য, "ট্রাডিশনকে বাদ দিয়ে জীবনের সঙ্গে যোগহীন উৎকট পরীক্ষামূলক নাটক করার মোহ আমাদের নেই। বাংলা নাটকের মৌল সুরের সঙ্গেই নবতর বুদ্ধিবাদী তথা জীবনবাদী নাটক সৃষ্টি করাকেই আমরা অন্বিষ্ট মেনেছি।" আমি আনন্দিত যে গন্ধর্ব-র এই বক্তব্য তাদের প্রযোজিত নাট্যোৎসবে সর্বাংশে না হলেও অনেকাংশে সার্থকতা লাভ করেছে। এই নাট্যোৎসবে বারোটি একাঙ্ক অভিনীত হয়েছে। তার মধ্যে দুইটি কাব্যনাট্য। একটি রাম বসু-র 'নীলকণ্ঠ' অপরটি কৃষ্ণ ধরের 'একরাত্রির জন্য'। এ ছাড়া বাকী দশটি একাঙ্ক জীবনরীতিসমৃদ্ধ

হলেও শিল্পরীতিতে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র। প্রতীকী, প্রহসন এবং মনস্তাত্ত্বিক নাটকও ছিল এর অন্তর্ভুক্ত।

অতনু সর্বাধিকারী-র 'অন্যস্বর', গিরিশঙ্করের 'রক্তকরবীর পরে', অমর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যার রঙ', সুরঞ্জন মিত্রের 'নেপথ্য দর্শন', চিত্তরঞ্জন ঘোষের 'দেবরাজের মৃত্যু', মনোজ মিত্রের 'পাখির চোখ', তৃপ্তি চৌধুরীর 'মাটির রঙ সবুজ', অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সূর্যের মতো সমুদ্র', ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়ের 'একচক্ষু' ও মমতা চট্টোপাধ্যায়ের 'উড়ো পাখির ছায়া' অভিনীত নাটকগুলির নাম। এই নাট্যোৎসবের নির্দেশনামায় ছিলেন তরুণ শক্তিমান অভিনেতা ও পরিচালক শ্যামল ঘোষ। মঞ্চস্থাপত্যের দায়িত্ব নিয়েছিলেন শিল্পী পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। আবহসঙ্গীতে হৃদয় কুশারী, আলোকসম্পাতে রঞ্জিত মিত্র এবং শব্দপ্রক্ষেপনে প্রভাত হাজরার কর্মকুশলতা উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সাহায্য করেছিল। মঞ্চসজ্জার দিক থেকে 'অন্যস্বর' ও 'একরাত্রির জন্য' এবং সর্বাঙ্গীন প্রযোজনার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে 'সূর্যের মতো সমুদ্র' এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করেছে। 'সন্ধ্যার রঙ', পাখির চোখ', 'একচক্ষু' এবং 'রক্তকরবীর পরে' তিনটি বিভিন্ন স্বাদের নাটক প্রতীকী ব্যঞ্জনায় দর্শকদের চিন্তিত করেছিল। এবং নতুনতর নাট্য আঙ্গিক পরিবেশনে গন্ধর্বগোষ্ঠীর এই উৎসব নাট্যানুরাগীদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিভিন্ন নাটকের অভিনয়কর্মে যাঁদের পরিশ্রমী নিষ্ঠা এই উৎসবকে সাফল্য দিয়েছে তাঁদের মধ্যে মমতা চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা চক্রবর্তী, দ্বিজু ভাওয়াল, মনোজ মিত্র, গিরিশঙ্কর, কণিষ্ক রায়, অবনী ভট্টাচার্য, দেবকুমার ভট্টাচার্য ও অসিত দে-র নাম উল্লেখ্য। তবে যৌথ প্রচেষ্টাতেই উৎসব সার্থক হয়। তাই স্বতন্ত্র নামোল্লেখে এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই যে অনুল্লিখিত অন্যান্য শিল্পীদের যত্ন ও নিষ্ঠা ছাড়াই গন্ধর্ব-র ছয়মাসব্যাপী এই নাট্যোৎসব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত।

সুস্মিত রায়

লেখকদের প্রতি নিবেদন

- অনুগ্রহ করে কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হরফে লিখবেন
- রচনা সম্পাদকের নামে পাঠাবেন
- এতৎসম্পর্কিত চিঠিপত্র সম্পাদকের নামে লিখবেন
- উপযুক্ত ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে লেখা সম্পর্কে মতামত জানানো বা অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব হয় না।
- সম্পাদকীয় দপ্তর তিন মাস পরে অমনোনীত রচনার পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে দায়ী থাকবেন না।

গ্রাহকদের সুবিধার্থে ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত ২৯শ বর্ষের বর্ষসূচীর প্রথম পৃষ্ঠাটি আমরা আর একবার প্রকাশ করলাম।

বর্ষসূচী

শ্রাবণ ১৩৬৬—আষাঢ় ১৩৬৭ [১৮৮১—৮২]

বর্ষসূচী

শ্রাবণ ১৩৬৭—আষাঢ় ১৩৬৮ (১৮৮২-৮৩)



পরিচয়

পৌষ ১৩৬৮

অংশু দত্ত
বিষ্ণু দে
সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়
শেখ আবদুল জব্বার
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
কালিদাস দত্ত
অজিত গঙ্গোপাধ্যায়
হিরণকুমার সান্যাল
অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়
বার্ণিক রায়
সমীরকুমার মুখোপাধ্যায়
শম্ভুনাথ দাস
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সত্য গুপ্ত

সম্পাদক

গোপাল হালদার মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়